ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের আসল চেহারা

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের আসল চেহারা

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের আসল চেহারা

গ্রন্থ প্রনেতা: মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

প্রকাশক:
ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স
১৬, সিলভেস্টার হাউস
লন্ডন ইআই ২ জেডি, ইউ কে

প্রথম প্রকাশ:
৪ জুলাই, ২০১১

কভার ডিজাইন: মারুফ আহমদ

মুদ্রণে:
এস এস প্রিন্টার্স
৩৮/ডি গ্রীন রোড,
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে গ্রন্থটির মুদ্রণ ও বিতরণ নৈতিকতা বিরোধী

মূল্য:
৭৫ টাকা (বাংলাদেশে)
৩ পাউন্ড (ইংল্যান্ডে)
৫ ডলার (আমেরিকায়)

www.pathagar.com

উৎসর্গ :

ভারতসহ সারা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিমদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. ভূমিকা

২. প্রাথমিক মন্তব্য

৩. জনৈক ধর্মান্ধের ভাষায় ... ৩২-৫৩

৪. জনৈক স্বপ্রণোদিত মৌলবাদী ... ৫৪-৫৬

৫. অস্বচ্ছ গ্রেফতার ... ৫৭-৬৯

৬. এটা নিছক অপরাধ স্বীকারোক্তিই নয় ... ৬০-৭৯

৭. পরিশিষ্ট:

ক. বিচারপতি হসবেট সুরেশ'এর বিবেক-তাড়িত মন্তব্য ... ৮০-৮৮

খ. ভারতীয় সেনাবাহিনীতে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গীবাদ ... ৮৯-৯৮

গ. সন্ত্রাসের কিছু চিত্র ... ৯৯

www.pathagar.com

ভূমিকা

ভারতের ২০ কোটি মুসলমানদের ওপর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের জুলুম অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা ভারতের মূলধারার মিডিয়াগুলো সব সময়ই উপেক্ষা করে। ভারত নিজেকে বিশ্বের সর্ব বৃহৎ গণতন্ত্র বলে দাবী করলেও, ভারত সরকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে যে আচরণ করে, তাতে এ গণতন্ত্রকে হাস্যকর বলেই মনে হয়।

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সনে লাখ লাখ মৌলবাদী ও কট্টরপন্থী হিন্দুরা একত্রিত হয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পার্টির ছত্রছায়ায় ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। মসজিদ ভাঙ্গার পর পরই শুরু হয় মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা, যার ফলে প্রাণ হারায় ১০ হাজারের অধিক নিরীহ মুসলমান। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত তার সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার প্রয়োজন মনে করে নি। বরং উল্টো প্রতিবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার মিথ্যে মামলা দিয়ে জেল-হাজতে পাঠায়। হিন্দু কট্টরপন্থী সংগঠন - বজরং দল, শিবসেনা, আরএসএস (রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ) কট্টরপন্থী বিজেপি'র রাজনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাবরী মসজিদকে ভেঙ্গে রাম মন্দির বানানোর পরিকল্পনা হাতে নেয়। তৎকালীন ও বর্তমান ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পার্টি এ পরিকল্পনার অনুকূলে গ্রীন সিগন্যাল অর্থাৎ অনুমোদন দেয়। মুসলমানদের ভোটের সাহায্যে ক্ষমতাসীন পার্টি মুসলমানদের ঘরে আগুন লাগায়, এটাই হলো হিন্দু রাজনীতি।

২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ সনে গুজরাট রাজ্যের গোদরা স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া সাবারমতি এক্সপ্রেসের একটি বগিতে আগুন লেগে যায়, যার কারণে ৫৮ জন হিন্দু কট্টর পন্থীর মৃত্যু ঘটে। ভারতের পত্র-পত্রিকা ও ইলেক্টনিক মিডিয়াগুলো কোন তদন্ত ও প্রমাণ ছাড়াই মুসলমানদের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আধুনিক ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বর্বরতম বর্বরতা শুরু হয়। ৩০ হাজারের বেশী নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করা হয়। চার হাজার মুসলিম মহিলা হিন্দুদের ধর্ষণের

www.pathagar.com

শিকার হন এবং আজ পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশী মুসলমান নিখোঁজ রয়েছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নজরদারিতে মুসলমানদের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করা হয়। একই সময়ে একই পরিবারের ২১ জন মুসলমান নর-নারীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। প্রাণ রক্ষার্থে হাজার হাজার মুসলমান প্রতিবেশী পাকিস্তান এমনকি বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। অনেকেই আজ পর্যন্ত তাদের ঘর-বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন নি।

তৎকালীন হিন্দু কট্টর পন্থী দল বিজেপি রাজ্যে ও কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল এবং একই দলের নেতা গুজরাটের কসাই হিসেবে পরিচিত নরেন্দ্র মোদি ছিল গুজরাট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (চীপ মিনিস্টার)। তারই নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালানো হয়, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছে। রাজ্য সরকার, পুলিশ, প্যারা-মিলিটারী, প্রশাসন ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে গুজরাট রাজ্য, তথা ভারত, হতে নির্মূল করতে উদ্যত হয়। ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানী গুজরাট দাঙ্গার আগে ইসরাইল ও স্পেন সফরে যান এবং ঐ দুই দেশ হতে মুসলমানদেরকে কিভাবে উৎখাত করা হয়েছে, সে জ্ঞান অর্জন করে আসেন। ইহুদীরা মুসলিম প্যালেস্টাইন এবং ইউরোপীয়রা মুসলিম স্পেন থেকে কিভাবে মুসলমানদেরকে উৎখাত করেছিল, সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য ঐ দুটি দেশ সফর করেন।

২০১১ সনের ১৫ জানুয়ারী ভারতের 'তেহেলকা' সাময়িকী আশীষ কৃতান হিন্দু মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের ওপর একটি প্রতিবেদন লেখেন, যা' ভারতীয় মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণ করে। প্রতিবেদনটিতে একজন হিন্দু কট্টর পন্থী সোয়ামী অসীমানন্দের চাঞ্চল্যকর জবানবন্দী চাপানো হয়। এ জবানবন্দীতে হিন্দু কট্টরপন্থীরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী বোমা হামলা চালিয়ে এসবের দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর দোষ চাপিয়েছে, সে ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দেয়। আলোচ্য গ্রন্থটি ঐ প্রতিবেদনের পুনঃপ্রকাশ বিশেষ। প্রতিবেদনটি হিন্দু সংবাদিক আশীষ কৃতানের প্রচেষ্টার ফসল এবং তা' ভারতীয় হিন্দু

www.pathagar.com

মালিকানাধীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ পাঠে পাঠকরা অনুধাবন করতে পারবেন – প্রকৃত মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী কারা। আজকের বিশ্বে যে কোন জায়গায় বোমা হামলা হলে মুসলমানদের ওপর দোষ চাপানো হয়। কিন্তু এই বই পড়ার পর পাঠকদের ধারণা পাল্টে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ গ্রন্থ হিন্দু বর্বরতা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। মুসলমানরা যে শান্তিপ্রিয় ধর্মের শান্তিপ্রিয় অনুসারী তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে। এ গ্রন্থের মাধ্যমে সভ্য বিশ্বকে ভারতীয় কংগ্রেস থেকে শুরু করে আরএসএস, কমিউনিস্ট পার্টিসহ সব দলকে কট্টরপন্থী মৌলবাদী, জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। সন্ত্রাসের মিথ্যে ও বানানো চাপিয়ে দেয়া অভিযোগে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে নিরাপরাধ লাখ লাখ মুসলিম বন্দীর মুক্তি প্রদানে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা মানবিক কারণেই আমি প্রত্যাশা করি। ভারতীয় মুসলমানরা যেন ভবিষ্যতে আর নির্যাতিত না হয়, এবং সম-অধিকার নিয়ে নির্ভয়ে বসবাস করতে পারে তেমন পরিবেশ তৈরী করার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের অনুরোধ জানাচ্ছি।

তেহেলকা সাময়িকী কর্তৃপক্ষ ও সাংবাদিক আশীষ কৃতান ভারতীয় হিন্দু সন্ত্রাসীদের মুখোশ উন্মোচনে যে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন, তা' প্রশংসার যোগ্যতা রাখে। 'তেহেলকা'র প্রতিবেদনটির বঙ্গানুবাদসহ তথ্য-সমৃদ্ধ সংযোজিত দুটো নিবন্ধের সমন্বয়ে শোভিত এ গ্রন্থ পাঠকদের কাছে নিয়ে যেতে অনন্য প্রচেষ্টার জন্য সাংবাদিক ও গবেষক মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এস এম গয়াছ উদ্দিন
লন্ডন, যুক্তরাজ্য,
১ জুলাই, ২০১১

www.pathagar.com

প্রাথমিক কথা

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের দ্বিতীয় ভাগে ক্রমাগত বোমা হামলা ভারতকে প্রকম্পিত করার প্রেক্ষাপটে সংবাদ মাধ্যমের অফিসমূহ এমনসব তথ্যে ভরে যেত যে, মুসলিম সন্ত্রাসীরা এসব বোমা হামলার সাথে সরাসরি জড়িত। এ সময় একটা প্রশ্ন আমার মতো অনেক-কেই তাড়িয়ে বেড়ায় — ভারতীয় মুসলমানরা আসলেই কি উন্মাদ হয়ে গেল? তারাই কি এসব বোমা হামলার হোতা? নাকি তারা তাদের প্রতিপক্ষ স্বার্থান্বেষীমহলের পাতানো চক্রান্তের শিকার? তবে আমার সরল উপসংহার ছিল এমন: বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত একটি কোনঠাসা প্রান্তিক সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় কোনভাবেই নিজেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিংবা ব্যাপক সংখ্যাগুরু, তথা ভারতের শাসকদের বিরুদ্ধে, এমন সন্ত্রাসী হামলা চালানোর সাহস পাবার কথা নয়। সুতরাং অবশ্যই কোথাও কোন না কোন গোলমাল রয়েছে, কিংবা রয়েছে কোন অপশক্তির দীর্ঘ মেয়াদী বহুমুখী চক্রান্তের জাল। আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হলো। সত্য বেরিয়ে এলো। সাম্প্রদায়িক হিন্দু সন্ত্রাসীরা ঘটনাক্রমে পাকড়াও হয়ে স্বীকার করলো: বোমা হামলা তারাই চালিয়ে এর দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অন্যতম হোতা অসীমানন্দ নামক জনৈক হিন্দু কারাগারে তার প্রতি মুসলিম বন্দীদের অমায়িক আচরণ ও সেবাদানের প্রেক্ষিতে কৃতজ্ঞতাবোধ, সর্বোপরি তার বিবেকবোধে তাড়িত হয়ে আদালতে জবানবন্দী দিয়ে মুসলমানদের দায়মুক্ত করে। আর 'তেহেলকা' নামক একটি ভারতীয় সাময়িকী (১৫ জানুয়ারী, ২০১১, ভলিউম ৮, দ্বিতীয় সংখ্যা) তা প্রকাশ করে। উদার মানবতাবাদী আমার সহোদর-প্রতীম এস এম গয়াস উদ্দিন সেই বিবরণী পুস্তাকারে প্রকাশ করে একটি অনন্য মানবিক দায়িত্ব পালন করেছেন যা' নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। মুসলিম-বিরোধী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদ ভারতীয় সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌছিয়ে দিয়ে এস এম গয়াস মানবতার অনুকূলে অবস্থান নিয়ে

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। এ পুস্তিকায় তেহেলকা'র বিবরণী দেখিয়ে দিয়েছে ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দুত্ববাদী ভারতে অবিরাম কেমন বৈরী পরিবেশে আতঙ্কিত জীবন যাপন করছেন। এতে অনুভূত হয় দুশ্চিন্তাহীন জীবন-যাপন করতে হলে স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। ভারত স্বাধীন হলেও ভারতীয় মুসলমানরা স্বাধীন ভারতে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নয় ।

ভারত এ সত্যিটি লুকানোর জন্য বহুবিধ পন্থা অবলম্বন করে থাকে। তা' সত্বেও মুসলিমবিরোধী চক্রান্ত, অবহেলা, বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব, সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা কোন কোন সময় এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, ভারত কোনভাবেই তার গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভাওতা ঢেকে রাখতে পারে না। বস্তুতঃ এ দুটো ভারতে কখনোই ছিল না। গণতন্ত্র মানে কেবল ভোট দেয়া নয়, বরং জীবন ও সম্পদের, মান-ইজ্জত রক্ষার এবং সর্বক্ষেত্রে সম-সুযোগ ও অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা থাকা । গত ৬৪ বছরে ভারত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের খোয়াড় হতে বের হতে পারে নি। ১৫ জানুয়ারী ২০১১ তেহেলকা (ভলিউম ৮, দ্বিতীয় সংখ্যা) হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের দোষ স্বীকারেক্তিমূলক যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাতেই ভারতীয় গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভাওতাবজি প্রকটভাবে ধরা পড়ে।

সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অনুঘটকরা ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম, প্রশাসনে কিভাবে শিকড় গেড়েছে 'তেহেলকা' সে চিত্রের অংশ বিশেষ তুলে ধরেছে। ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণকারীদের প্রভাব বা প্রশ্রয় এর পেছনে ছিল বলেই এমনটি হয়েছে। এ প্রবণতা কেবল ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যই নয়, বরং ভারতের সামগ্রিক শান্তি, সমৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা, ঐক্য-সংহতির জন্য বিপদ সংকেত বিশেষ। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরা যেকোন সময় ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্যও বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস, আদর্শ, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়, দল, উপদলে — এমনকি বহু জাতপাতে বিভক্ত হলেও একটি বিষয়ে তারা অভিন্ন অবস্থানে ঐক্যবদ্ধ — তা হলো তাদের কেউই মুসলমানদের প্রতি সুবিচারে

www.pathagar.com

বিশ্বাস করে না। তারা বাহ্যতঃ তথাকথিত মানবতাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, কট্টর, সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট, বা আস্তিক-নাস্তিক হলেও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠতে পারে নি। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণই যথেষ্ঠ।

তথাকথিত বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে একাধারে পশ্চিম বাংলা শাসন করছে। অথচ তাদের মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণে সর্বক্ষেত্রে মুসলমানরা উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে।

বিব্রত বামফ্রন্ট সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের অভিযোগ ছিলঃ সাচার কমিটির রিপোর্টে তাদের অনেক ইতিবাচক তথ্যই নাকি উঠে আসেনি। যেমন পশ্চিম বঙ্গের কতোজন মন্ত্রীর ড্রাইভার মুসলমান বা এই ধরনের অন্য তথ্য সাচার কমিটির রিপোর্টে বাদ গেছে। অর্থাৎ মন্ত্রীদের ড্রাইভারদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী — এ তথ্য সাচার কমিটি না দেখিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের মুসলিম প্রীতিকে নাকি খাটো করেছে। সাম্প্রদায়িক বামদের এমন অভিযোগ মুসলমানদের প্রতি তাদের নির্মম কৌতুক বিশেষ! জ্যোতিবসু থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো বুর্জোয়া কমরেডদের কেউই মুসলিম-বিরোধিতা হতে মুক্ত ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গের কারাগারগুলোতে মুসলমান বন্দীদের সংখ্যা ও অনুপাত কত বামফ্রন্ট সরকার সে পরিসংখ্যান পরিকল্পিতভাবে সাচার কমিটিকে দেয়নি। কারণ বামফ্রন্ট সরকার মুসলিমবিরোধী আসল চেহারা গোপন রাখতে চেয়েছিল। সারা ভারতের মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও হিংস্রতার শিকার। ভারতীয় মুসলমানরা তাদের সংখ্যানুপাতে কোন ক্ষেত্রে সুষম অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না।

ইউকিপিডিয়া (Wikipedia) প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ২০১১ সনে ভারতে মোট জনসংখ্যার (১.২১ বিলিয়ন বা একশত একুশ কোটি) ১৩.৪ শতাংশ মুসলিম। ২০০৯ সনের হিসেব মতে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৬১ লাখ। নির্ভরযোগ্য মুসলিম সূত্রসমূহের তথ্যানুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৫ থেকে ১৭ শতাংশই মুসলমান। আবার কোন কোন মুসলিম প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে দাবী করে যে, ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার

www.pathagar.com

২০ শতাংশের ওপর। কলিকাতা হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি কে. এম. ইউসুফ ভারতের প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা 'দ্য হিন্দু'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ভারতে মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে ২৫ শতাংশ মুসলমান। সরকারের মতলবী নীতি মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মহল থেকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে।

মুসলমানদের অভিযোগ ভারত সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা স্বীকার করে না, বরং কমিয়ে দেখায়। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই ইসলামকে দ্রুত-বর্ধিষ্ণু ধর্ম হিসেবে দাবী করা হয়। ভারতীয় পত্র-পত্রিকার অভিযোগ মুসলিম দম্প্রতিরা অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মানোর কারণে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা এমন হারে বাড়ছে যে, পরবর্তী শতাব্দীতে নাকি মুসলমানরা ভারতে সংখ্যাগুরুতে পরিণত হবে। অথচ এ প্রচারণা সরকারী পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হয় না। ভারতীয় মুসলমানদের অভিযোগঃ সরকারী হিসেবে মুসলিম জনসংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা থেকে অর্ধেকের মতো (১২-১৩ শতাংশ) কমিয়ে দেখানো হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বঞ্চনার পাহাড় খাটো করে দেখানোর উদ্দেশ্যেই এমনটি করা হচ্ছে।

ভারতের মোট মুসলিম জনসংখ্যার প্রকৃত হিসেব যেমন বিশ্ববাসীর জানা নেই, তেমনি তাদের জানা নেই ভারতীয় মুসলমানরা কেমন উপেক্ষা, প্রবঞ্চনা, নিপীড়ন ও নিষ্পেষণের শিকার। 'লজ এঞ্জেলস টাইমস'এর ১ ডিসেম্বর (২০০৮) সংখ্যায় একটি নিবন্ধের শিরোনাম ছিল — Muslims are India's new untouchables (মুসলমানরা হলো ভারতের নব্য অস্পশ্য সম্প্রদায়)। ভারতীয় মুসলমানদের দুঃসহ অবস্থা অনুধাবনের জন্য এ শিরোনামটিই যথেষ্ট। এ অবস্থা একদিনে হয় নি।

গান্ধী-নেহেরু থেকে আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় হিন্দুনেতা-নেত্রী মুসলিম-বিরোধী সাম্প্রদায়িক চেতনা হতে বেরিয়ে আসতে পারে নি বিধায় মুসলমানরা ভারতের কোন ক্ষেত্রেই সমতাসূচক সুবিচার পায়নি । ভারতের নীতি-নির্ধারক থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থা, এমনকি প্রচার মাধ্যম — প্রকাশ্যে-গোপনে চরম মুসলিম-বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক হবার কারণে মুসলমানদের করুণ অবস্থা

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তো দূরের কথা, ভারতবাসীও জানে না। তাদের দুঃসহ অবস্থার যতোটুকু আর ঢেকে রাখা যায় না, তা-ই কেবল প্রচার মাধ্যমে কিংবা তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ পায়। বাকী সব ঘটনা-দুর্ঘটনা অন্ধকারেই থেকে যায়।

ভারত সারা বিশ্বে সর্বাধিক দাঙ্গা-কবলিত দেশ। ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, আঞ্চলিকতা, এমনকি রাজ্যগত ও রাজনৈতক বিরোধে ভারত সত্যিকার অর্থে ক্ষত-বিক্ষত। এর মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায়। ১৯৪৭ সনের পর হতে ভারতে কতো সহস্র মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গা হয়েছে, এতে কতো মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে, তাদের কি পরিমাণ সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে, এসবের প্রকৃত পরিসংখ্যান — ভারত সরকার সংরক্ষণের চেষ্টা করে নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপকতা অনুধাবনে ভারতীয় সাংবাদিক আশীষ নন্দীর একটি মন্তব্যই যথেষ্ট। তিনি লিখেছেন:

"As India is getting modernised communal violence is increasing. In early centuries, riots were rare. After independence, we have used to have one riot a week, now we have more than one a day." (The Illustrated Weekly of India, July 20, 1986, Bombay—440001, India). (ভাবানুবাদ: ভারত আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হবার সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাও বেড়ে চলেছে। আগের শতাব্দীগুলোতে দাঙ্গা কদাচিত ঘটেছে। স্বাধীনতার পর প্রতি সপ্তাহে আমরা একটি করে দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেছি। আর এখন প্রতিদিন একটির বেশী দাঙ্গা ঘঠে)।

মুসলিম বিরোধী এসব দাঙ্গা এক-পাক্ষিক, যা' মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। এটা সহজেই অনুমেয় যে, মুসলমানরা সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে। কোন সাহসে ও যুক্তিতে ৮০.৫ শতাংশ হিন্দুদের বিরুদ্ধে তারা দাঙ্গায় লিপ্ত হবে? একজন মুসলমান কিভাবে সাতজন হিন্দুর সাথে আত্মরক্ষার জন্য লড়বে? তাই দাঙ্গায় মুসলমানদের প্রাণহানি একেবারে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দাঙ্গাকারীদের প্রতিহত না করে বরং হিন্দু দাঙ্গাকারীদের পক্ষাবলম্বন করে। পুলিশও সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বাইরে যেতে পারে না। পুলিশ বাহিনীতে

www.pathagar.com

মুসলমানদের অসম প্রতিনিধিত্ব পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশ বাহিনীতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব তারই ইঙ্গিত বহন করে:

রাজ্য	মুসলিম জনসংখ্যা (%)	পুলিশে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব (%)
অন্ধ্র প্রদেশ	৯.১৭	১৩.২৫
আসাম	৩০.৯২	১০.৫৫
বিহার	১৬.৫৩	৫.৯৪
জম্মু-কাশ্মীর	৬৬.৯৬	৫৬.৩৬
কর্ণাটক	১২.২৩	৬.৭১
কেরালা	২৪.৭০	১২.৯৬
মহারাষ্ট্র	১০.৬০	৪.৭১
তামিল নাড়ু	৫.৫৬	.১১
ত্রিপুরা	৭.৯৫	২.০১
উত্তর প্রদেশ	১৮.৫০	৪.২৪
পশ্চিম বাংলা	২৫.২৫	৭.৩২
দিল্লী	১১.৭২	২.২৬

অনেকের তিক্ত মন্তব্য, দাঙ্গায় নিহত মুসলমানরা এক অর্থে সৌভাগ্যবান। কারণ সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাহীনতা, দুঃখ-যাতনা, প্রবঞ্চনা, অপমান, নির্যাতন, বেকারত্ব, অনাহার, অর্ধাহারজনিত বেদনাবোধের জ্বালা থেকে দাঙ্গায় নিহত হওয়া অনেক শ্রেয়ঃ। কারণ যারা বেঁচে আছেন তারা প্রতিনিয়ত মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়েও ভয়ঙ্কর বেদনা বহন করে চলেছেন। এ কাহিনী এতো ব্যাপক ও দীর্ঘ যে, কয়েকশ' গবেষক কয়েক দশক অবিরাম অনুসন্ধানী গবেষণা চালিয়েও প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হবে না। ভারত সরকার মাঝে মাঝে হয়তো নিজেদের অপরাধবোধ থেকে কিংবা সংখ্যালঘু তথা পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীকে কেমন সাফল্যজনকভাবে তারা কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়েছে, সে খবর নেয়ার জন্য তথ্যানুসন্ধানী কমিটি গঠন করে। কমিটিগুলো সীমিত আকারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুঃসহ ও অমানবিক অবস্থার যে খন্ডিত চিত্র তুলে ধরে এক কথায় তা' লোমহর্ষক। এগুলো দূরীভূতকরণে কমিটিগুলো যেসব পরামর্শ দিয়েছে, তার কোনটাই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে এমন নজির ভারত সরকারের হাতে নেই।

www.pathagar.com

ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণদানকরী প্রতিষ্ঠান লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল একাডেমী অব এডমিনেস্টশন একেবারে রক্ষণাত্মক পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেছে, ১৯৬৮ ও ১৯৮০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে ১,৫৯৮ জন মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়। আর এর বিপরীতে ৫৩০ জন হিন্দু মারা যায়। মুম্বাই-ভিত্তিক মুসলিম গবেষক আসগর আলী ইনজিনিয়ার সম্প্রতি এক গবেষণায় দাবী করেছেন দাঙ্গায় মুসলিম প্রাণহানি এমন হার ২০০৫ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

অন্যদিকে দাঙ্গা-পরবর্তী পুলিশী তৎপরতা সার্বিকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই চালানো হয়। ১৯৮২ সনে মিরাটে, ১৯৭৮ সনের আলীগড়ে অথবা ১৯৭০ সনে বিওয়ান্দিতে সংঘঠিত দাঙ্গার বিচারিক তদন্তে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগে, গ্রেফতারে বা বন্দীদের প্রতি আচরণে নির্মম কঠোরতা প্রয়োগ করা হয়েছে।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল একাডেমী'এর মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়, দাঙ্গাকারীদের গ্রেফতারে পুলিশ হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের পাকড়াও করতেই বেশী তৎপরতা দেখায়। ১৯৮০ সনে দাঙ্গায় ৮৯ জন হিন্দু এবং ২৭৫ জন মুসলিম নিহত হয়। অথচ দাঙ্গায় অংশ নেয়ার অভিযোগে পুলিশ ৫,৪৫৭ জন হিন্দু এবং ৫,৭৪৩ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করে। এ দাঙ্গায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা তিনগুণের বেশী নিহত হওয়া সত্বেও অধিক সংখ্যক মুসলমানদের গ্রেফতার ভারতীয় পুলিশের মুসলিমবিরোধী নোংরা ভূমিকার বাস্তবতা উন্মোচিত করেছে। এতে দেখা যায়, দাঙ্গায় একজন হিন্দুকে হত্যার অভিযোগে ৫,৭৪৩/ ৮৯ = ৬৪ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে প্রতিজন মুসলিম হত্যার জন্য ৫,৪৫৭/২৭৫ = ২০ জন হিন্দু গ্রেফতার হয়।

বিগত বছরগুলোতে সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মুসলমানদের অপদস্ত ও বিব্রত তথা কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যে হীন কৌশল অবলম্বন করে। হিন্দুরা সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে হামলার দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয় আর ভারতীয় পুলিশ কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই তাৎক্ষণিক নির্দোষ মুসলমানদের গ্রেফতার

www.pathagar.com

করে। অন্যদিকে ভারত সরকার প্রতিবেশী পাকিস্তান, এমনকি বাংলাদেশকে এ ধরনের হামলার জন্য দায়ী করে । আর ভারতীয় প্রচার মাধ্যম সারা বিশ্বজুড়ে ভূয়া খবর পরিবেশন করে। ভারতীয় মিডিয়া ভারত সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে বারংবার অভিযোগ করে যে, পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই বাংলাদেশীদের ব্যবহার করে ভারতের ভেতরে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়। অসীমানন্দের দোষ-স্বীকারোক্তিমূলক ৪২-ব্যাপী ঐতিহাসিক জবানবন্দী প্রথমবারের মতো এ সত্যকে উন্মোচন করে যে, ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরাই হিন্দু মন্দির, মুসলিম মসজিদ ও মাযার, পাকিস্তানগামী 'সমঝোতা এক্সপ্রেস' এমনকি সিমি অফিসসহ সব ধরনের হৃদয় বিদারক বোমা হামলার নেপথ্য নায়ক। এর মানে এ দাঁড়ালো যে, বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলার জন্য মুসলমানদের অহেতুক ও অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। অসীমানন্দের জবানবন্দী সম্পূর্ণ দৃশ্যপট পাল্টে দিয়ে সত্যকে উন্মোচন করেছে যে, বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠনসমূহ সন্ত্রাসী হামলার মূল অনুঘটক । সারা বিশ্বের, বিশেষতঃ ভারতীয়, মুসলমানদের উচিত অসীমানন্দকে ধন্যবাদ জানানো — যেহেতু তার স্বীকোরুক্তিই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের মুখোশ উন্মোচন করে দেখিয়ে দিয়েছে নিরাপরাধ মুসলমানরা কেমন অন্যায়-অবিচারের শিকার ।

ক্ষমতাসীন বা বিরোধীদলের সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলিমবিরোধী এসব পূর্ব-পরিকল্পিত চক্রান্ত কেবল গ্রেফতারকৃত মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশাই বাড়ায় না, বরং পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাবন্দী থাকার কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মানসিকভাবে জর্জরিত, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ এমনকি ধবংস হয়ে যায়। মুসলমানরা ভিত্তিহীন ও ভূয়া অভিযোগের শিকার। ভারতে সংঘঠিত প্রতিটি সন্ত্রাসী হামলার পরে সাধারণ হিন্দুরা প্ররোচিত ও উত্তেজিত হয়ে তাদের প্রতিবেশী নিরাপরাধ মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। এমনি আক্রমণে গুজরাটে দু'হাজারের বেশী মুসলমান নির্দয়ভাবে নিহত হয়। মুসলিমবিরোধীরা ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ গুড়িয়ে দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয় নি, কোন প্ররোচণা ছাড়াই মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা শুরু করে।

www.pathagar.com

তাদের নব্য কৌশলের অন্যতম দিক হচ্ছে: প্রতিটি সন্ত্রাসী হামলার পর অজ্ঞাত কোন হিন্দু হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে কোন মুসলিম সংস্থার পক্ষ থেকে কোন প্রিন্ট বা ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার অফিসে ফোন করা । সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা বুঝা কঠিন যে, টেলিফোনকারী আদতেই কি কোন মুসলিম, নাকি সে অমুসলিম এবং মুসলমানদের ফাসানোর জন্য মুসলমানদের অমুসলিম দুশমনরা মুসলমানদের নামে হামলার দায়িত্ব স্বীকার করছে, নাকি এসব গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর গবেষণাগারে প্রস্তুতকৃত নাটক। সাম্প্রদায়িকতা দোষেদুষ্ট মিডিয়া এমন ভূয়া ফোন পাবার পর সত্যাসত্য যাচাই না করে সাথে সাথে তা' প্রচার করে। পরবর্তীকালে এ ধরনের তথ্য মিথ্যে প্রমাণিত হতে কয়েক বছর সময় লাগে। আর এরই মধ্যে নিরাপরাধ মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনেক সময় নিরপেক্ষ ও ব্যাপক তদন্ত চালানো হয় না বলে মুসলমানরা ঐ মিথ্যে ও বানানো অভিযোগের শিকার হয়ে বিচারে দোষী সাব্যস্থ হয়। অথচ যথার্থ তদন্ত চালানো হলে হিন্দু কুচক্রীদের চক্রান্তের লোম-হর্ষক সন্ত্রাসী হামলার প্রকৃত কাহিনী বেরিয়ে আসতো।

অসীমানন্দ যে কাহিনী বিবৃত করেছে, যা' তেহেলকা পরবর্তীকালে প্রকাশ করেছে, তা এ বাস্তবতাকে উন্মোচন করেছে যে, হিন্দু মন্দির ও আশ্রম হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের নিরাপদ অভয়ারন্য, যাদের সাথে ভারতের সর্বক্ষেত্রে, এমনকি সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। হিন্দু সন্ত্রাসীরাই হামলা চালিয়ে এবং এর দায়িত্ব মুসলমানদের উপর চাপিয়ে মুসলমাদের সাথে আল-কায়েদা ও তালেবান নেটওয়ার্কের যে সম্পর্ক রয়েছে এমন অভিযোগও সত্য বলে মিডিয়াকে জানায়। এমনকি বাংলাদেশকে ইসলামী সন্ত্রাসীদের আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্য সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের নামও জুড়ে দেয়। এর ফলে ভারতের সাথে কেবল পাকিস্তানেরই নয়, বাংলাদেশের সম্পর্কেরও অবনতি ঘটে। ভারতীয় মিডিয়ায় এমন খবরও এসেছে যে, ভারতে সংঘঠিত সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িত থাকার কারণে কিছু বাংলাদেশীকে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কথিত ভারতবিরোধী সন্ত্রাসীদের

www.pathagar.com

মূলোৎপাটন করতে ভারতের বিভিন্ন মহল হতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা চালানোর দাবী তোলা হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলিম দেশসমূহকে সন্ত্রাসের হোতা হিসেবে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় নর্জুমরা কালবিলম্ব না করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ আমলে নেয়—যদিও ভারত নিজেই একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র এবং সে তার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশসমূহে সন্ত্রাস ছড়ায়।

ভারতীয় নীতি-নির্ধারক ও নেতৃবৃন্দ যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার উর্দ্ধে উঠতে পারেন নি, তার প্রতিফলন তাদের অনুসৃত নীতিতে থেকে স্পষ্ট হয়। তাদের অনুসৃত নীতি হলো মুসলমানদেরকে এমন কোণঠাসা ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ে পরিণত করা, যাতে তারা আর এস এস'এর ভাষ্যমতে হয়তো ভারত হতে পালিয়ে যাবে কিংবা হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হবে। ভারতীয় নীতি-নির্ধারকদের এমন সাম্প্রদায়িক নীতির কারণে সাধারণ হিন্দুরাও চরম মুসলিমবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক হয়ে যায়। এ কারণেই ভারত সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। একই নীতি মুসলমানদের ধর্মীয়ভাবে নির্যাতিত, রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা, শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদ, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দেউলিয়া এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করছে। ভারতের প্রতিটি অঙ্গনে ভারত সরকারের এ সাম্প্রদায়িক নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। পশ্চিম বাংলায় বাম শাসনামলে মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িকতার ধরন তুলে ধরে সাচার কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাকা রাস্তাটি সংখ্যালঘু এলাকার ঠিক একটু আগে থেমে গেছে। স্কুল-কলেজ এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যা সংখ্যালঘুদের উপকারে আসেনি। (মিজানুর রহমান, দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, মে ৩০, ২০১১) ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় মুসলমানদের প্রতি বাম সরকারের নির্যাতন ও চরম বঞ্চণার কথা স্বীকার করে বলেছেন, অনেক মুসলিমকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তিনি জানান, গত ৩৪ বছরে মাত্র দেড় শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ চাকরি পেয়েছেন। (শফিকুল ইসলাম, দৈনিক আমার দেশ, ২৮ জুন, ২০১১)।

www.pathagar.com

ভারতের কোন সরকারই গত ৬৪ বছরে মুসলমানদের প্রতি সুবিচার করে নি। সাচার কমিটির প্রতিবেদন ২০০৬ সনে প্রকাশ করা হলে সারা ভারতে, এমনকি বহির্বিশ্বে হৈচৈ হলেও প্রতিবেদনটির সুপারিশ বাস্তবায়নে লোক দেখানো প্রচারণা ছাড়া বাস্তবে কিছুই করা হয় নি। মুসলমানদেরকে অধঃপতিত অবস্থান থেকে তুলে আনার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সরকার আন্তরিক হলে এ বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নেয়া হতো। হিন্দুত্ববাদী দলগুলো হিন্দুদের আরো বেশী সমর্থন আদায়ের জন্য মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার দেয় না। আর কংগ্রেসের মতো তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো হিন্দুদের সমর্থন হারানোর ভয়ে সাম্প্রদায়িক বিজেপি'র মতোই আচরণ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেস বিজেপি'র চেয়েও চরম সাম্প্রদায়িকতা প্রদর্শন করে। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার সময় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন কেবল হিন্দুদের সমর্থন ধরে রাখার জন্যই নয়, এর মূল কারণ হলো কংগ্রেসও সাম্প্রদায়িক, এবং সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে নয়। বাবরী মসজিদ রক্ষায় কংগ্রেস সরকার ইচ্ছুক ছিলনা বলেই তা' ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে। ১৪ লাখের বেশী সেনাসদস্যসহ সারা ভারতের প্রায় দুই কোটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য রয়েছে। অথচ একটি মসজিদ তারা রক্ষা করতে পারে নি, এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়? অন্য দিকে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পর মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা শুরু করে হিন্দুরা হাজার হাজার নিরাপরাধ মুসলমানকে হত্যা করে। কংগ্রেসীরা মুখে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু আসলে কট্টর সাম্প্রদায়িক। গান্ধী-নেহেরু'র উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী তাদের মুখেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বাস্তবে আর অন্তরে তারাও ছিলেন নিরব সাম্প্রদায়িক। ৬৪ বছর পরেও আধুনিক কংগ্রেসীরা সাম্প্রদায়িকতা ছাড়তে পারে নি। আর বিজেপিগং কথায় আর কাজে উভয় ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক । সব মিলিয়ে মুসলিম বিরোধিতায় কংগ্রেস ও বিজেপি, এমনকি আরএসএস' আর কমিউনিস্টদের মধ্যে মূলতঃ বাস্তবে কোন পার্থক্য নেই। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, বিজেপি, আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দলসহ সবদলের অনুসারী আমলা, পুলিশ, বিচারক, আইনপ্রণেতাদের হাতে

www.pathagar.com

মুসলমানরা সমভাবে নিগ্রহীত, উপেক্ষিত ও অত্যাচারিত। অর্থাৎ মুসলিমদের অধিকারহীন রাখতে, তাদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করতে ধর্মান্ধ, ধর্ম নিরপেক্ষ, নাস্তিক, কমিউনিস্ট — এক কথায় সব হিন্দুরাই ঐক্যবদ্ধ। কারণ তাদের সবাই কট্টর মুসলিম-বিরোধী সাম্প্রদায়িক। তাই শাসক ও শাসক দলের পরিবর্তন হলেও মুসলিমবিরোধী নীতির কোন পরিবর্তন হয় না। একেবারে ধর্মে বিশ্বাস করে না, এমন কমিউনিস্ট-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম সম্প্রাদায়ের অধোগতি ও বঞ্চনা প্রমাণ করে কোন হিন্দুই মুসলিম-বিরোধী সাম্প্রদায়িক মন-মানসিকতার উর্দ্ধে উঠতে পারে নি। সর্বশেষ খবর হলো, তথাকথিত কমিউনিস্ট নামধারী অমিত্যসেন সব মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হবার অসার যুক্তি ও গল্প ফেঁদে প্রমাণ করল তারা কেমন কট্টর সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম-বিরোধী। সুতরাং তাদের কাছে মুসলমানরা ন্যায় ও সুবিচার পাবে এমন প্রত্যাশা দুরাশা ও নিরেট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এরা ভারতীয় তথা সারা বিশ্বের মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। অন্যদিকে হিন্দু ভোট টানতে মুসলিম-বিরোধী কুৎসা রটিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হয়। আর বুদ্ধিজীবীরা মুসলিমবিরোধী লেখালেখি করে হিন্দুদের কাছে অমরত্ব লাভের চেষ্টা করে ।

ভারতীয় বিচার বিভাগও একই রোগে আক্রান্ত। বাবরী মসজিদ নিয়ে মুসলমানদের আইনী লড়াইয়ে যে রায় দেয়া হয়েছে, তাতেই বিচার বিভাগের আসল চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। বাবরী মসজিদের স্থানে রাম মন্দির ছিল — হিন্দুদের এ অসার দাবীর পক্ষে সামান্যতম দলিল না থাকায় বিচারকরা বাবরী মসজিদের জমি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করার এক আজগুবী রায় দিয়েছেন। একজন শিশুও বোঝে জমির মালিক হয়তো মুসলমানরা অথবা হিন্দুরা — কোনভাবে বাদী-বিবাদীরা যৌথ মালিক হতে পারে না। হিন্দুদের খুশী করার ইচ্ছা তথা সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকেই এমন রায় হয়েছে। হিন্দুদের দাবীর পক্ষে সামান্য প্রমাণ থাকলেও ঐ ভূমি হিন্দুদেরকেই দিয়ে দেয়া হতো। এ রায় হলো কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সাম্প্রদায়িকতাপ্রসূত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বহির্প্রকাশ।

www.pathagar.com

হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ কেবল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটতরাজ, ঘরবাড়ী-কবরস্থান-মসজিদ-মাদ্রাসা-মাযার দখলের মধ্যেই সীমিত নয়, চাকরিসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা এবং সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও তারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে রেহাই পায় না। এ কারণেই মুসলমানদের সংখ্যা সরকারের অস্বচ্ছ পরিসংখ্যান ১৩ শতাংশকেই সত্যি হিসেবে মেনে নিলেও সরকারী চাকরিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব গড়ে চার শতাংশের নিচে। প্রতিরক্ষাসহ সরকারের উঁচু পর্যায়ে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব দুই শতাংশেরও কম। এম নাওশাদ আনসারি 'টুসার্কেল.নেট' (TwoCircles.net)'এ লিখেছেন, ২০১০ সনে ভারতে প্রশাসনিক সার্ভিস (আইএএস) পরীক্ষার বাছাইকৃত ৮৭৫ জনের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ জন। আর ২০০৯ সনে ৭৯১ জনের মধ্যে ৩৬ জন ছিল মুসলিম। অর্থাৎ চাকরির এ শাখায় মুসলিম প্রতিনিধিত্ব চার শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশে নেমে এসেছে বলে আনসারী মন্তব্য করেছেন।

সাচার কমিটির রিপোর্ট ভারতীয় মুসলমানদের বঞ্চনার যে বিবরণ তুলে ধরেছে, তা' — এককথায় অবিশ্বাস্য ধরনের সত্য। ভারতের আমলা বাহিনীতে (আইএএস, আইএফএস, আইপিএস) মুসলিম প্রতিনিধিত্ব মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশ। সরকার স্বীকৃত মুসলিম জনসংখ্যা অনুযায়ী সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব কমপক্ষে ১৩ শতাংশ হওয়া উচিত। আর বেসরকারী দাবী মতে ২০ শতাংশ হওয়া উচিত।

মুসলমানদেরকে বঞ্চিত রাখার কূটকৌশল হিসেবে তাদেরকে মেধাহীন, অযোগ্য ও অশিক্ষিত হওয়াকে দায়ী করা হয়। কিন্তু এ অবস্থার জন্য কারা দায়ী? সুযোগ পেলে মুসলমানরাও যে হিন্দুদের চেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে, তার প্রমাণ ভারতের পরমাণু বোমার পুরোধা আবুল ফকির জয়নুল আবদীন আবদুল কালাম (Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam)। সারা বিশ্বের ৫৩টি মুসলিম দেশের প্রত্যেকটিতে সুপেরিয়র সার্ভিস তথা প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, সশস্ত্র বাহিনীগুলো তো মুসলিমরাই চালাচ্ছে। বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সৈন্যরা যদি তাদের স্বদেশের সেনাবাহিনীতে যোগ্যতা অর্জন করে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখাতে পারে, তবে

www.pathagar.com

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মুসলমানদেরকে কেন নেয়া হচ্ছে না? ভারতীয় মুসলমানরা দেশপ্রেমিক, সাহসী ও বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও ভারতে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার শিকার হয়ে তারা সে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। তাদেরকে পরিকল্পিত উপায়ে বঞ্চিত করে দাবিয়ে রাখা হয়েছে।

ভারতীয় সাংবাদিক প্রফুল্ল বিদওয়াই এশিয়া টাইমস অনলাইন (৯ নভেম্বর, ২০০৯)এ 'India's veneer of religious integration' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমানরা পরিকল্পিত নির্মূল অভিযান ও চরম বৈষম্যের মুখোমুখি। চরম বৈষম্যের কারণে ভারতের বহুদিনের পিছিয়ে থাকা অধঃপতিত অস্পশ্য দলিত সম্প্রদায় মুসলমানদের পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেছে। আর দলিতদের অবস্থানে চলে গিয়েছে মুসলমানরা। সরকারী চাকরি, শিক্ষার হার, আয়, সামাজিক অবস্থান ও চাকরি প্রাপ্তির সুযোগে মুসলমানরা এখন সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জাতি, এমনকি দলিতদের তুলনায়ও । উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শহরাঞ্চলে ৮০ শতাংশ মুসলিম বালকরা বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে দলিতদের শতকরা হার হচ্ছে ৯০। ১৯৯৫ সনে মাত্র ৭২ শতাংশ দলিত বালক স্কুলে যেত।

পল্লী অঞ্চলে ৬৮ শতাংশ মুসলিম এবং ৭২ শতাংশ দলিত ও অন্যান্য-সম্প্রদায়ের ৮০ শতাংশ মেয়েরা স্কুলে যায়। অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায় গ্রামে-শহরে সর্বত্রই দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ১৯৬৫ সনে ৫২ শতাংশ মুসলিম এবং ৪০ শতাংশ দলিত মেয়ে বিদ্যালয়ে যেত। এখন মুসলিম পরিবারগুলো আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যার মুখোমুখি হওয়ায় দলিতরা তাদের ছাড়িয়ে গেছে। মুসলিম গবেষক আনসারীর অভিযোগ: পৌর এলাকায় মুসলিমদের বসবাস এমনসব স্থানে যা বিদ্যুত, রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য পৌর সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত।

সাচার কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানরা সর্বাধিক বৈষম্যের শিকার। ১২টি রাজ্যের পরিসংখ্যান উল্লেখ করে ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মুসলমানরা গড়ে ঐসব রাজ্যে মোট জনসংখ্যার ১৫.৪ শতাংশ হলেও চাকরিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র ৫.৭ শতাংশ। পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে ২৫.৪ শতাংশ মুসলমান। অথচ সরকারী চাকরিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব

www.pathagar.com

মাত্র ৪.২ শতাংশ। বিচার বিভাগে মুসলিম উপস্থিতি আরো কম: উড়িষ্যায় ১.৫ শতাংশ, পশ্চিম বাংলায় ৫ শতাংশ, এবং কেরালায় ১২.৩ শতাংশ (কেরালায় মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার ২৪.৭ শতাংশ)।

পুলিশ ও কূটনৈতিক ক্যাডার সার্ভিসে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব ১.৬ শতাংশ থেকে ৩.৪ শতাংশে সীমিত। সারা ভারতে সর্বাধিক কম সংখ্যক স্নাতক ডিগ্রীর অধিকারী সম্প্রদায় হলো মুসলমান — ৩.৬ শতাংশ। সশস্ত্র বাহিনীতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব মাত্র ২ শতাংশ। গোয়েন্দা সংস্থাসমূহে, বিশেষতঃ বৈদেশিক গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য গঠিত 'র' (রিসার্চ এন্ড এ্যানালাইসিস উইং), ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড এবং অন্যান্য নামকরা প্রতিরক্ষামূলক বাহিনীতে কোন মুসলিমকে চাকরি দেয়া হয় না। পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পদে কোন মুসলমানকে বসানো হয় না।

সাচার কমিটি জানিয়েছেন, ভারতের রাজ্য পর্যায়ের বিভাগগুলোতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব মাত্র ৬.৩%, রেলওয়েতে ৪.৫%, ব্যাংকে ২.২, আধা-সামরিক বাহিনী (সিআরপি, সিআইএস, বিএসএফ, এসএসবি এবং অন্যান্য) তে ৩.২%, ডাক বিভাগে ৫%, বিশ্ববিদ্যালয়ে (১২৯ বিশ্ববিদ্যালয় ও ৮৪ টি কলেজে) ৪.৭%, সব ধরনের সরকারী চাকরিতে ৪.৯%, কেন্দ্রীয় PSUs তে ৩.৩%, রাজ্য PSUs তে ১০.৮ %।

বিভিন্ন রাজ্য সরকারী চাকরিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

রাজ্য	মোট মুসলিম জনসংখ্যা (%)	সরকারী চাকরিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব (%)	PSU চাকরিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব (%)	
			উচ্চপদ	নিম্ন পদ
আসাম	৩০.৯	১১.২	তথ্য নেই	তথ্য নেই
পশ্চিম বাংলা	২৫.২	৪.২	তথ্য নেই	১.৪
কেরালা	২৪.৭	১০.৪	৯.৫	১১.১
উত্তর প্রদেশ	১৮.৫	৫.৪	৬.২	৫.৩
বিহার	১৬.৫	৭.৬	৮.৬	৬.৪
ঝাড়খন্ড	১৩.৮	৬.৭	তথ্য নেই	তথ্য নেই

www.pathagar.com

কর্ণাটক	১২.২	৮.৫	৮.৬	৯.৯
দিল্লী	১১.৭	৩.২	২.১	৫.৬
মহারাষ্ট্র	১০.৬	৪.৪	১.৯	১.১
অন্ধ্রপ্রদেশ	৯.২	৮.৮	তথ্য নেই	তথ্য নেই
গুজরাট	৯.১	৫.৪	৮.৫	১৬.০
তামিল নাড়ু	৫.৬	৩.২	৩.২	৩.৬
সর্বমোট	১৫.৪	৬.৪	৩.২	২.৬

(Bias and the Police: Praveen Swami: The Frontline, Vol. 23 – Issue 24: Dec. 02, 2006: source: National Crime Recorurea, 2004, Census 2001)

বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সাচার কমিটি ভারতীয় মুসলমানদের পশ্চাদপদতা তুলে ধরেছে। কমিটি ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে জানিয়েছে, মুসলিম অধ্যুষিত প্রতি তিনটি গ্রামের মধ্যে একটিতে কোন বিদ্যালয় নেই। প্রায় ৪০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে কোন স্বাস্থ্য-সুবিধা নেই। প্রসব-কালীন মৃত্যু, কম ওজন বিশিষ্ট শিশু, রক্তশূন্যতায় ভোগে এমন মহিলার সংখ্যা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশী। ভারতের বাকী জনগণের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাথাপিছু ক্যালোরী তথা পুষ্টিমান অনেক নিচে। সাচার কমিটির মন্তব্য: বৈষম্য, অবহেলা, উপেক্ষা, পক্ষপাতিত্ব নিরবে সয়ে নেয়াই যেন ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যলিপি।

চাকরিসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে মুসলমানরা চরমভাবে বঞ্চিত হলেও, অবদমন ও অকারণে নির্যাতন ভোগের বেলায় তাদের অবস্থান সবার উপরে। প্রফুল্ল বাদওয়াই সাচার কমিটির রির্পোট উদ্ধৃত করে লিখেছেন: কারাগারে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক। মহারাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ১০.৬ শতাংশ মুসলমান। আর ঐ রাজ্যের কারাবাসীদের ৪০.৬ শতাংশই মুসলিম। দিল্লীতে মোট জনসংখ্যার ১১.৭ শতাংশ মুসলিম, কিন্তু কারাগারে তারা ২৭.৯ শতাংশ। গুজরাট রাজ্যে মোট জনসংখ্যার ৯.১ শতাংশ মুসলিম। আর কারাবাসীদের ২৫.১ শতাংশ মুসলিম। তামিলনাড়তে মোট জনসংখ্যার ৫.৬ শতাংশ মুসলিম। কারাবাসীদের ৯.৬ শতাংশ মুসলিম। আর বাম শাসিত, যাদেরকে মানুষ পুরোপুরি উদার ও

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ বলেই মনে করে, সেই পশ্চিম বাংলায় মোট সংখ্যার ২৫.৪% মুসলমান হলেও কারাবন্দী মুসলমানদের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেশী। নিচের পরিসংখ্যান তারই প্রমাণঃ

জেলখানার নাম	মোট বন্দী	হিন্দু	মুসলিম	অন্যান্য	মুসলিম %
দমদম	২,১৩৭	৩৯৭	১,৬৯৬	৪৩	৭৯.৩৬
আলীপুর	১,৯৯৯	১,০১০	৯৫০	২৪	৪৭.৫২
প্রেসিডেন্সি	২,৩০২	৯০২	১,৩৮৫	১৫	৬০.১৭
মেদিনীপুর	১,০৫৬	৩৮৪	৬৬৪	৮	৬৪.৮৮
জলপাইগুড়ি	৯৬৯	৪৫৫	৫০৫	৯	৫২.১২
বহরমপুর	১,৬৮৬	৪২৭	১,২৩৫	২৪	৭৩.২৫

(দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯ মার্চ, ২০১১)

চাকরিসহ সর্বক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায় বঞ্চিত হলেও উপরোক্ত পরিসংখ্যান প্রমাণ করছে, অত্যাচার-অবিচার ভোগের ক্ষেত্রে তারা সবার উপরে।

প্রখ্যাত ভারতীয় রাজনৈতিক তাত্ত্বিক রাজিব ভারগাভাসহ বহু সমালোচক মুসলিম-বিরোধী বৈষম্য ও অবিচার বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারের সন্ত্রাস-বিরোধী কৌশলকে দায়ী করেছেন। তাদের মতে, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও ইসলাম-ভীতি থেকেই মুসলিমবিরোধী চরম নিবর্তনমূলক ও পক্ষপাতমূলক আচরণের শিকার মুসলিম সম্প্রদায়। কোন কিছু ঘটলেই সাথে সাথে বলে দেয়া হয় এর জন্য মুসলমানরা দায়ী। এর পরেই নেমে আসে গণহারে নিরাপরাধ মুসলিম গ্রেফতার এবং তথাকথিত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য চরম অমানবিক নির্যাতন। ছোটখাট অপরাধ থেকে শুরু করে বড় ধরনের কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই মিডিয়ার, সরকারের, পুলিশের, গোয়েন্দা সংস্থার প্রথম সন্দেহের তীর যায় মুসলিম সম্প্রদায়ের দিকে। এ কারণেই ভারতীয় কারাগারে এতো বেশী সংখ্যক মুসলমান বন্দী জীবন যাপন করছেন। একটা জাতিকে নিঃশেষ করার জন্য এটা সরাসরি সরকারী উদ্যোগ।

রাজিব ভারগাভা বলেন, তিক্ত সত্যি হলো, মুসলমানরা দীর্ঘদিন যাবত পরিকল্পিত বর্জন তথা নির্মূলীকরণ ও পক্ষপাতদুষ্ট নীতির শিকার। তার মতে, পশ্চিম ইউরোপের সাবেক উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো জাতিগত সংখ্যালঘু বা

www.pathagar.com

আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি যেমন বর্ণবাদী নির্মম আচরণ করেছে, ভারতীয় মুসলমানরা তেমন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব ও নির্মমতার শিকার। এ পক্ষপাতিত্বের মূল কারণ মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নীতি।

তেহেলকা সাময়িকী যে চিত্র তুলে ধরেছে, তা রাজিব ভারগাভা'র বিশ্লেষণের প্রামাণ্য প্রতিফলন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানরা চরমভাবে প্রতিনিধিত্বহীন। মুসলমানরা যদি ১৩ শতাংশও হয়ে থাকে, তবে ভারতীয় লোকসভায় মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা কমপক্ষে ৬৫ হওয়া উচিত। কিন্তু এ সংখ্যা কখনোই ৩০-৩৫ জনের বেশী ছিল না। অন্যদিকে কোন কোন রাজ্য বিধানসভায় মুসলিম প্রতিনিধিত্ব শূন্য শতাংশ, কোথাও বা আধা শতাংশ। গুজরাটে মোট জনসংখ্যার ৯.০৬ শতাংশ মুসলমান। অথচ গুজরাটে ক্রমাগত চারটি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী সরকারসমূহে (২০১১ সন পর্যন্ত) একজন মুসলিমকেও মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয় নি। প্রতিটি জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের আগে সারা ভারতে মুসলিম-বিরোধী প্রচারণা এমনকি দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। এর মূল কারণ হলো সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে মুসলিমবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া। আর মুসলিমবিরোধী প্রচারণা চালিয়েই শতধা-বিভক্ত হিন্দুদের মধ্যে একতা জিইয়ে রেখে ভারত এখনো বিভক্তি হতে রক্ষা পাচ্ছে।

ভারতীয় মুসলমানরা বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। তাদের দাবী প্রত্যেক ক্ষেত্রে — ভারতীয় লোকসভা, বিধানসভাসহ সর্বধরনের চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় তাদের প্রতিনিধিত্ব অন্ততঃ ২০ শতাংশ হতে হবে। তাদের মতে বিচার বিভাগ, আইনসভা-বিধানসভা, প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ সর্বত্র মুসলিম প্রতিনিধিত্ব সম্মানজনক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের বেকারত্ব যেমন হ্রাস পাবে, অন্যদিকে তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষার নিরাপত্তা সুদৃঢ় হবে। সাম্প্রদায়িক ভারত সরকার তাদের দাবী বিবেচনা করছে বা করবে এমন কোন আলামত দেখা যায় না। মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত ও দুর্বল, সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা না থাকার কারণেই সব শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের ওপর চড়াও হবার সুযোগ ও সাহস পাচ্ছে।

www.pathagar.com

কিন্তু আমি মনে করি চারদিকে কট্টর মুসলিম-বিরোধী সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত মুসলমানদের জন্য সর্বক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতীয় মুসলমানদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও আপন ভাগ্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে তেমন সম্ভবনা নেই। কারণ কট্টর মুসলিম-বিরোধী জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিবেষ্ঠিত থেকে তারা কখনই নিরূপদ্রব জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে না। সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার প্রদানের পাশাপাশি ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদেরকে স্ব স্ব রাজ্যের জনসংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেলায় সরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করলে অন্ততঃ পক্ষে মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গা কিংবা স্বাভাবিক সময়েও কথায় কথায় মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের চড়াও হবার প্রবণতা বন্ধ হয়ে যাবে। মুসলমানদের মনে নিরাপত্তাহীনতা ও সংখ্যালঘু হবার মনস্তাত্ত্বিক হীনমন্যতাবোধ দূরীভূত হবে। ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক সংহতি সুদৃঢ় হবে। আর মুসলমানরা ভারতের উন্নয়নে তাদের মেধা ও শ্রম প্রদানে আরো সক্রিয় ও উৎসাহী হবে।

এ সমস্যা সমাধানে আরো বেশী যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া অন্যান্য রাজ্যর মুসলমানদের জন্য ভারতের অভ্যন্তরে পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া। যেমন আসামে মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের বেশী মুসলমান। আসামের ২৭টি জেলার মধ্যে ছয়টিতে মুসলমানরা সরাসরি সংখ্যাগুরু। এগুলো হলোঃ বারপেট্রা, ডুবরি, গোয়ালপাড়া, নওগাঁ, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি। এছাড়া কাছাড়, কোঁকড়াঝাড়, বঙ্গাইগাঁও, জোড়হাট, শিবসাগর, ডিব্রগড়, গোয়ালঘাটসহ বাকী অধিকাংশ জেলাতে চোখে পড়ার মতো মুসলমান বসবাস করে। এসব অঞ্চলে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গ-হাঙ্গামা তুলনামূলকভাবে কম। কিংবা মুসলমানরা বিব্রতকর অবস্থায়ও তেমন পড়ে না। ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম, অরুনাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ডে নগন্য সংখ্যক মুসলমান বসবাস করে, যেখানে হয়তো ৫০-৬০ মাইলের মধ্যে একটি মুসলিম পরিবার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অরুনাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলায়

www.pathagar.com

মুসলমানদের সংখ্যা ২২৫। আর পূর্ব কামেং জেলায় ৩৮৪। এসব মুসলমান ঐ দুটো জেলার প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এসব সংখ্যালঘু মুসলমানদের সুরক্ষার জন্য তাদেরকে একটি রাজ্যে সরিয়ে নেয়া কঠিন কিছু নয়। অনেকেই এমন প্রস্তাব তথা উদ্যোগকে অনেক কারণে অবাস্তব কিংবা ভারত-বিরোধী তথা পুনরায় ভারত-বিভক্তির চক্রান্ত বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু ভারতে চিরন্তর শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এ প্রস্তাব বর্তমান পরিস্থিতির একমাত্র স্থায়ী বিকল্প হতে পারে। কয়েক শতাব্দী পরে হলেও ভারতকে এ বাস্তবতা মেনে নিতে হবে।

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, উপমহাদেশ বিভক্তির সময় অবিভক্ত উপমহাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশের বেশী ছিল মুসলিম। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে উপমহাদেশ ভাগ হবার কারণে উপমহাদেশের '৪৭-পূর্ব মোট আয়তনের ৪২,৩৫,৫৩০ কি.মি.'এর মধ্যে মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে মাত্র ৯,৪৭,৯৪০ বর্গ কি.মি। ৮,০৩,৯৪০ বর্গ কি.মি পশ্চিম পাকিস্তানকে আর ১,৪৪,০০০ কি.মি. পূর্ব পাকিস্তানকে, অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশকে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ তৎকালীন মুসলিম জনসংখ্যা অনুসারে ৪,৬৩,৯০৩ বর্গ কি.মি. ভূখন্ড মুসলমানদের দেয়া হয়নি, যা বর্তমান বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় ৩.৫ গুণ বড়। এ ভূখন্ড ভারতের দখলে রয়েছে। এ স্থানটি (৪,৬৩,৯০৩ বর্গ কি.মি.) মূলতঃ মুসলিম দেশ পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হবার কথা। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, ভারতে তো মুসলমানরা এখনো আছে এবং থাকবে, সুতরাং ৪,৬৩,৯০৩ বর্গ কি.মি. ভূমি ভারতের দখলে থাকা অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু এমন যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বহু মুসলিম অঞ্চল রয়েছে, যেগুলো জনসংখ্যানুপাতে সাবেক পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হবার কথা। অথচ ভারত চক্রান্তমূলকভাবে সেগুলো ভারতের অন্তর্ভূক্ত করেছে। জম্মু-কাশ্মীর ছাড়াও নিজাম শাসিত হায়দারাবাদ ভারত শক্তি প্রয়োগ করে দখল করেছে। বর্তমান আসামের বাংলাদেশ-সংলগ্ন কমপক্ষে ছয়টি জেলা এবং পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ, মালদাহ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, এমনকি কলিকাতার ৪০ শতাংশ,

www.pathagar.com

১৯৪১ সনের জনসংখ্যার নিরিখে বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত হবার কথা। আর দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে ত্রিপুরা ভৌগোলিক সন্নিহিতার কারণে উপমহাদেশ বিভক্তির মূলনীতি অনুযায়ী বাংলাদেশভূক্ত হবার কথা। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই পূর্ব বাংলার অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল। সুতরাং ত্রিপুরা বাংলাদেশেরই অন্তর্ভূক্ত হবার কথা। জুনাগড় মানভাদর কচ্ছ পাকিস্তানের অংশ নেবার কথা। ভারত অন্যায়ভাবে নানা কারসাজির মাধ্যমে ঐসব ভূখন্ড ভারতভূক্ত করেছে। এসব তথ্য বানানো নয়, তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় এবং ভারত বিভক্তির ওপর লেখা নিরপেক্ষ গ্রন্থসমূহে এতদসংক্রান্ত দলিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

আসামের জনগণ যে পাকিস্তানে যোগ দেয়ার জন্য কেবল মানসিকভাবে প্রস্তুত, এমনকি রাজী ছিল, সে তথ্য ধামাচাপা দেয়া যাবে না। এতো সেদিন, গুর্খাল্যান্ড নেতা সুভাষ ঘিষিং প্রকাশ্যে বলেছেন — দার্জিলিং ভারতের অংশ নয়, দার্জিলিংয়ের উচিত বাংলাদেশের সাথে মিশে যাওয়া। ঘিষিং তার লেখা বইতে স্বীকার করেছেন যে, দার্জিলিং তথা শিলিগুড়ি করিডোরের পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হওয়া এমন বাস্তব ছিল যে, ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্টের পরবর্তী আড়াই দিন ধরে দার্জিলিং টাউন হলে পাকিস্তানী পতাকা উড়েছিল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে সংযোগ সৃষ্টির জন্য ২১ মাইল চওড়া শিলিগুড়ি করিডোর ভারতকে দেয়ার কারণে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ভারতের দখলে চলে যায়। এসব জেলার বিনিময়ে পাকিস্তানকে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানকে কোন বাড়তি ভূমি দেয়া হয় নি। একই ঘটনা ঘটেছিল বর্তমান আসামের গোয়ালপাড়াসহ অন্যান্য জেলাতেও। উলেখ্য, ঐতিহাসিকভাবে গোয়ালপাড়া বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৮৭৪ সনে প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে বাংলার সিলেট ও গোয়ালপাড়া আসামের সাথে জুড়ে দেয়া হয়। ১৯৪৭ সনে ভারত গোয়ালপাড়ার সাথে সাথে সিলেটকেও ভারতের সাথে রেখে দেয়ার চেষ্টা চালায়। যদিও ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট থেকে পরবর্তী ৩/৪ দিন গোয়ালপাড়াতে পাকিস্তানী পতাকা উড়ছিল। পরে পুলিশ এসে জোর করে সে পতাকা নামিয়ে ফেলে। অন্যাদিক সিলেটের জনগণ গণভোটের মাধ্যমে

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সাথে যোগ দেয়ার পক্ষ্যে ব্যাপক রায় দেয়ায় সিলেট পূর্ব পাকিস্তান এবং সে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের অংশ হলেও ত্রিপুরার সাথে রেল যোগাযোগ রক্ষার অজুহাতে বাংলাদেশের প্রাপ্য সিলেটের একটি মহাকুমা করিমগঞ্জ (আয়তন ১,৮০৯ বর্গ কি.মি.) ভারতকে দেয়া হলেও এর বিনিময়ে বাংলাদেশকে কোন ভূমি দেয়া হয় নি। এ বিষয়গুলো নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন, যাতে তারা মুসলিম ঠকানোর হিন্দু মানসিকতা অনুধাবনে সক্ষম হয়।

হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষের নির্ভয়ে স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রাখে, বিশেষতঃ ভারত এমন একটি দেশ, যার নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগেই একে সব ধর্মবিশ্বাসীদের আবাসভূমি হিসেবে ঘোষণা করে। ধর্মীয় পরিচয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, ভারত নয়। মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান হলেও, হিন্দুদের জন্য একান্তভাবেই কিন্তু ভারত নয়। ভারত হিন্দু-মুসলিমসহ সব ধর্মবিশ্বাসীদের আবাসস্থল। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে শুরু করে বহু মুসলিম নেতা পাকিস্তান আন্দোলনের কেবল বিরোধিতাই করেন নি, তারা পাকিস্তানেও আসেন নি। এ কারণেই সরকারী হিসেবে ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৩.৪ শতাংশ আর বেসরকারী সূত্রমতে ২৫ শতাংশ এখনো মুসলিম। অন্যদিকে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান হলেও স্বাধীনতার পরপরই কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, পাকিস্তান শুধুমাত্র মুসলমানদের দেশ নয়, হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মালম্বারী নির্ভয়ে সম-সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানে বসবাস করার অধিকার রাখে।

এখনো বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ অধিবাসী হিন্দু। বাংলাদেশে হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামা বলতে গেলে হয়নি বললেই চলে। বাংলাদেশে চাকরি করতে ইচ্ছুক এমন বেকার হিন্দু পুরুষ-মহিলা প্রায় নেই বললেই চলে, যারা বেকার। হিন্দুরা যে কখনো কখনো দুস্কৃতিকারী, বিশেষতঃ ভূমিদস্যুদের, হামলার শিকার হয়নি, এমন নয়। তবে এসব হামলা ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত নয়। মুসলমানরাও তেমন হামলার শিকার।

ভারতীয় মুসলমানরা কেমন আতঙ্কিত দুঃসহ জীবন যাপন করছে, তেহেলকা

www.pathagar.com

তার অতি সামান্যই আমাদের সামনে তুলে ধরছে। সাচার কমিটিসহ বিভিন্ন দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও তাদের সুপারিশ মুসলমানদের যে করুণ চিত্র তুলে ধরেছে, তা স্মরণে রেখে ভারত সরকারের উচিত হবে মুসলমানদের মান-ইজ্জত, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেয়া — যার একটা ফর্মূলা আমি উপরে উপস্থাপন করেছি। ভারত সরকার বিষয়টি গভীর মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করলে, কেবল মুসলিম সম্প্রদায়ই নয়, পুরো ভারতবাসী উপকৃত হবে এবং ভারতের মুসলিম প্রতিবেশী দেশসমূহকে কথিত জঙ্গী প্রজনণ কেন্দ্র হিসেবে অহেতুক দুর্নাম রটানোর সংস্কৃতি হতেও সরে আসতে সাহায্য করবে। এতে পুরো দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে শান্তি ও সহাবস্থানের আবহ তৈরী হবে, যা ভারতের জন্যও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আর এ অঞ্চল থেকে বৈরীতা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের বিভীষিকা ধীরে ধীরে অপসৃত হবে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ তেমন পরিবেশ প্রত্যাশা করে।

তেহেলকার এ ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ দলিলসম প্রতিবেদন ইংরেজীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে সহোদর-প্রতীম এস এম গয়াস উদ্দিন একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। সে ধারাবাহিকতায় আমি ঐ গ্রন্থটির ভাবানুবাদ করে বাংলাদেশীসহ সারা বিশ্বের বাংলাভাষীদের সামনে বিষয়টি তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছি। ভারতীয় বিচারপতি হসবত সুরেশের একটি বক্তৃতার অংশ বিশেষ এ গ্রন্থে তুলে ধরেছি, যাতে ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অমানবিক চিত্র ফুটে উঠেছে, যা' এ গ্রন্থের মূল বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ছাড়া আমার লেখা 'পিলখানায় হত্যাকান্ড: টার্গেট বাংলাদেশ' নামক গ্রন্থ থেকে 'ভারতীয় সেনাবাহিনীতে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গীবাদ' শীর্ষক উপ-অধ্যায়টি এ গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে সংযোজিত হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি আরো তথ্যবহুল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলায় এ গ্রন্থটিরও প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন লন্ডনস্থ ইস্টার্ন পাবলিকেশন্'এর স্বত্বাধিকারী এস এম গয়াছ উদ্দিন, যিনি ইতোপূর্বে অতীব গুরুত্ববহ আমার আরো পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত

www.pathagar.com

করেছেন। বাংলায় এ গ্রন্থটির প্রকাশ করার মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ভারতের আসল চরিত্র তুলে ধরা। আমার বিশ্বাস এ গ্রন্থটি বাংলাদেশীদের দুশ্চিন্তাহীন নিরাপদ জীবনযাপনে স্বাধীনতার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনুধাবনে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে। বাংলাদেশের যে যে মহল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের গুণকীর্তন করে বাংলাদেশেও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার বরকন্দাজ হিসেবে কাজ করে, এ গ্রন্থ পাঠে তাদের সামান্যতম বোধোদয় হলে এ গ্রন্থ প্রকাশনা সার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষার ভাওতা ও আপদ হতে মুক্ত থাকার তওফিক দিন । আমীন।*

ঢাকা,
বাংলাদেশ,
৪ জুলাই, ২০১১

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

www.pathagar.com

জনৈক ধর্মান্ধের জবানীতে

স্বামী অসীমানন্দের নিরস জবানবন্দী হলো সমযোতা এক্সপ্রেস ট্রেনে বোমা হামলা এবং ২০০৬ সনে মালেগাঁও বিস্ফোরণের সাথে আর এস এস প্রচারকদের জড়িত থাকার প্রথম আইনী প্রামাণ্য দলিল। তেহেলকা'র পক্ষে আশীষ খিতান অসীমানন্দের ৪২-পৃষ্ঠাব্যাপী জবানবন্দীর সে লোমহর্ষক ভয়ার্ত উদ্দেশ্যমূলক গণহত্যার কাহিনী অন্যান্য সংবাদপত্রকে টেক্কা দিয়ে প্রকাশ করার পারঙ্গমতা প্রদর্শন করে:

১৮ ডিসেম্বর ২০১০, সি বি আই'এর গোয়েন্দারা ৫৯ বছর বয়সী নবকুমার সরকার — যে জনসাধারণ্যে স্বামী অসীমানন্দ হিসেবে পরিচিত — নামক জনৈক ভারতীয় বাংলাভাষীকে তিহার জেল থেকে দিল্লীর আদালতে নিয়ে আসে। তাকে মোট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দীপক দেবাসের সামনে হাজির করানো হয়। সে ২০০৭ সনে মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের প্রধান আসামী। ঐ বিস্ফোরণে নয়জন মুসলিম মারা যান। ওটা ছিল ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তার দ্বিতীয় দফা আদালতে হাজির হবার ঘটনা। ১৬ ডিসেম্বর অসীমানন্দ ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্ত্রাসী হামলায় তার জড়িত থাকার বিষয়ে তার স্বীকোরুক্তিমূলক জবানবন্দী বাণীবদ্ধ (রেকর্ড) করার জন্য অনুরোধ করে। সে বলেছিল যে, সে ভয়-ভীতি, শক্তি প্রয়োগ, কিংবা অত্যাচারের মুখে অথবা স্বার্থের বশীভূত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে জবানবন্দী দিচ্ছে না।

আইন অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট অসীমানন্দকে তার সিদ্ধান্তের (অপরাধ স্বীকার করে জবানবন্দী দেয়ার) ব্যাপারটি গভীরভাবে ভেবে দেখা জন্য পরামর্শ দেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে পুলিশের প্রভাবমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে দু'দিনের জন্য বিচারিক আদালতের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। (ম্যাজিস্ট্রেটের এমন নিরপেক্ষতা থেকে বাংলাদেশের বিচারক ও সরকারের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। বিচারকরা যেন সরকারের মতামতেরই প্রতিনিধিত্ব করেন।

www.pathagar.com

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিশ রিমান্ড চাইলেই আমাদের বিচারকরা তা উদারভাবে দিয়ে দেন। ট্রাফিক পুলিশের সাথে ওয়ার্ড কমিশনারের কথা কাটাকাটি হয়েছে — এমন অভিযোগে কেবল ওয়ারেন্ট জারীই হয়নি, বরং আত্মসমর্পণ করার পর তাকে রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে - অনুবাদক)

১৮ ডিসেম্বর অসীমানন্দ আরো দৃঢ় মনোবল নিয়ে আদালতে ফিরে আসে। ম্যাজিস্ট্রেট তার স্টেনোগ্রাফার ছাড়া অন্য সবাইকে তার চেম্বার ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। অসীমানন্দ বলেন, "আমি জানি আমার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি আমার দোষ স্বীকার করে জবানবন্দী দেব।"

পরবর্তী পাঁচঘন্টা, অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব নজির স্থাপন করে অসীমানন্দ লোমহর্ষক ধারাবাহিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিবরণ দেয়, যেগুলোর পরিকল্পনায় ও বাস্তবায়নে কতিপয় হিন্দুত্ববাদী নেতাসহ সে স্বয়ং জড়িত ছিল। বিগত ক'বছর ধরে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের নানাবিধ ভয়ঙ্কর ও জঘন্য গণহত্যা ও দুষ্কর্মের নানাবিধ কাহিনী ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে থাকে। প্রতিটি ঘটনাই যথার্থ বলে বিশ্বাস করার মতো পর্যাপ্ত দালিলিক প্রমাণ রয়েছে। প্রথমতঃ, ২০০৮ সনে স্বার্ধী প্রয়াগ ঠাকুর, দয়ানন্দ পান্ডে, লেঃ কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিত এবং অন্যান্যদের গ্রেফতার। দ্বিতীয়তঃ, পান্ডের ল্যাপটপ থেকে ৩৭টি অডিও টেপ উদ্ধার করা হয়, যেখানে সংশ্লিষ্টদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিবরণ রয়েছে। তৃতীয়তঃ, ২০০৭ সনে আজমীর শরীফে সংঘঠিত বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে রাজস্থান এ টি এস'এর চার্জশীট। চতুর্থতঃ অসীমানন্দের দোষ-স্বীকারমূলক জবানবন্দী, যা তদন্তকারী সংস্থাসমূহের জন্য ছিল খুবই গুরুত্ববহ।

ভারতীয় ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোর্ড'এর ১৬৪ ধারা মতে, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অপরাধ স্বীকোরুক্তিমূলক জবানবন্দীকে আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একারণে অসীমানন্দের জবানবন্দী আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অতীব গুরুত্ববহ, যা আরো অনেক রহস্য উন্মোচনে ভূমিকা রাখতে পারে।

www.pathagar.com

হিন্দুত্ববাদীদের মরণঘাতী বাহিনী

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসকে মুসলিম সন্ত্রাসীদের সমকক্ষ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ: বোমার বিনিময়ে বোমা

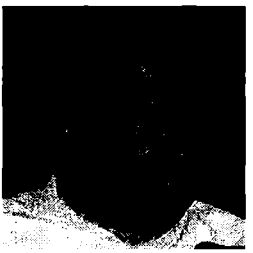

ইন্দ্রেস কুমার: আরএসএস'এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিন আসামী: অসীমানন্দ, লোকেশ শর্মা ও শিবরাম ঢাকাড এবং স্বাক্ষী ভারত রাতেশ্বর সিবিআই'কে জানিয়েছে ইন্দ্রেশ মেলাগাঁও, সমযোতা এক্সপ্রেস, আজমীর ও মক্কা মসজিদে সন্ত্রাসী হামলা চালাতে আরএসএস প্রচারকদের মদদকারী ও অর্থ যোগানদার হিসেবে কাজ করেছে।

স্বামী অসীমানন্দ: অসীমানন্দ আর এসএস'এর অনুমোদিত গুজরাটের দাঙ্গস্থ সার্বিধামের বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রধান। সন্ত্রাসীদের আদর্শিক গুরু হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হিসেবে সে তার অপরাধ স্বীকার করেছে। এছাড়া গুজরাটের দাঙ্গস ও ভালসাদে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসীদের সভায় সভাপতিত্ব করা ছাড়াও সে মালেগাঁও, আজমীর শরীফ ও হায়দারাবাদকে সন্ত্রাসী হামলার চালানোর লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করে।

সুনীল যোশী: মৌও (Mhow) জেলার আরএসএস'এর সাবেক প্রচারক। ২০০৬ সনে মধ্যপ্রদেশে দুইজন কংগ্রেস কর্মীকে খুন করার অভিযোগে আরএসএস তাকে বহিস্কার করে। মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, জম্মু ও ঝাড়খন্ড'এর কিছু আরএসএস প্রচারকদের সমন্বয়ে সে আন্তঃরাজ্য সন্ত্রাসী কাঠামো গঠন করে।

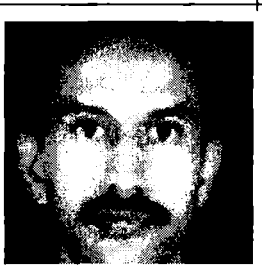

সন্দীপ দাঙে: ইন্দোরের নিকটবর্তী সাজহাপুর জেলার অধিবাসী সন্দীপ দাঙে আরএসএস'এর ঊর্ধ্বতন প্রচারক। মুসলিম ইবাদতখানায় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চক্রান্ত করে আসছিল। যোশী ও রামচন্দ্র এবং কালসালঙর মুসলিম প্রার্থনাগৃহে সন্ত্রাসী হামলার চক্রান্ত করে আসছিল। বর্তমানে সে পলাতক রয়েছে।

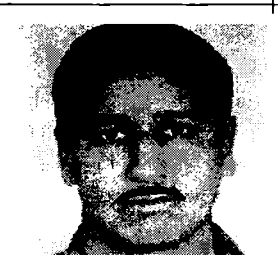

রামচন্দ্র কালসালঙার ওরূপে রামজী: রামচন্দ্র কালসালঙার ওরূপে রামজী মধ্যপ্রদেশে আরএসএস'এর প্রচারক। সে ২০০২ সনের ডিসেম্বর এবং ২০০৮ সনের ২৯ সেপ্টেম্বর'এর মধ্যবর্তী সময়ে মালেগাঁও এবং মোদাসাতে উপর্যুপরি বোমা হামলা চালায়। ২০০৮ সনের অক্টোবর থেকে সে পলাতক রয়েছে।

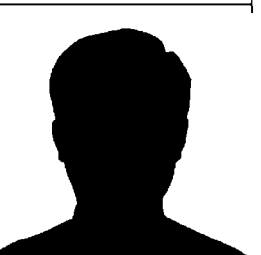

শিবভাম ঢাকাড: আর এসএস'এর একজন সক্রিয় কর্মী এবং অভিযুক্ত আসামী যোশী ও রামজী কালসালঙার সহযোগী। আরএসএস' এর অন্যান্য প্রচারকদের সাথে সেও ২০০৫ সনে বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ নেয়। সে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ট্রেনে সন্ত্রাসী হামলার পর গঠিত গোদরা কমিশনের চেয়ারম্যান ইউ সি ব্যানার্জির বাসভবনে গমন করে।

www.pathagar.com

লেঃ কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিত: সন্ত্রাসী সংগঠন অভিনব ভারতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সে নাসিকে সামরিক গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত ছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, সে তার সংগঠনে অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তাদের ভেড়ানোর চেষ্টা করেছিল। সে ২০০০ সনে মালেগাঁও ব্যবহৃত বোমার আরডিএক্স সরবরাহ করা সংক্রান্ত মামলার অভিযুক্ত আসামী।

দেবেন্দ্র গুপ্ত: বিহারের মুজাফফরনগর আরএসএস শাখার প্রচারক। সে যোশীকে সামরিক প্রযুক্তিগত বিষয়াদির ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান করে। কালসাংলাঙার ও দাঙে আত্মগোপনে থাকাকালীন সে তাদেরকে আরএসএস অফিসে আশ্রয় দিয়েছিল।

লোকেশ শর্মা: আরএসএস কর্মী। সে যোশী, দাঙে ও কালসাংলাঙা'র ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সে দুটো নকিয়া মোবাইল হ্যান্ডসেট কিনেছিল যেগুলো মক্কা মসজিদে ও আজমীর শরীফে বোমা হামলার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ভারতেশ্বর ওরফে ভারত ভাই: গুজরাটের ভালসাদ জেলাস্থ শ্রী বিবেকানন্দ কেন্দ্র সনাতন' (Sansthan)'এর প্রধান। অসীমানন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে সে তার বাসভবন ও শার্বিধাম আশ্রমে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন সভায় অংশ নিয়েছিল। সে বোমা হামলার উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদানের জন্য যোশীর সাথে ঝাড়খন্ড ও উত্তর প্রদেশ সফরে যায়।

যোগী আদিত্যনাথ: গোরাকপুর থেকে নির্বাচিত বিজেপি এমপি। সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানোর জন্য তহবিল সরবরাহে তার সাথে অসীমানন্দ যোগাযোগ করেছিল। ২০০৬ সনে বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা চালানোর চক্রান্ত পাকানোর সময় যোশী অসীমানন্দের বিরুদ্ধে তার বাসভবনে গোপন বৈঠকে বসে। অসীমানন্দের মতে, সে এ ব্যাপারে তেমন সক্রিয় সমর্থন দেয়নি। কিন্তু সে সন্দেহের মধ্যেই থেকে যায়।

ডঃ অশোক ভার্সনী, কানপুর আরএসএস'এর পান্থ প্রচারক। সে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত কুখ্যাত আসামী আরএসএস প্রচারক দেবেন্দ্র গুপ্ত পালিয়ে বেড়ানোর সময় তাকে ভানবাসী কল্যাণ আশ্রম এবং উত্তর প্রদেশের সীতাপুরস্থ বিশ্ব মঙ্গল গাঁও গ্রাম যাত্রা (Vishwa Mangal Gau Gram Yatra)'য় আশ্রয় প্রদান করেছে। ভার্সনী তদন্তকারীদের জানিয়েছে যে, ইন্দ্রেস গুপ্তের পক্ষে তারা ভার্সনীকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

www.pathagar.com

রাজেশ মিশ্র: আরএসএস কর্মী এবং মৌও'এর নিকটবর্তী পিথামপুরায় একটি ফাউন্ডির মালিক। ২০০১ সনে সে যোশীকে ১৫ খন্ড কাস্ট লৌহ খন্ড (15 cast iron shells) দিয়েছিল যেগুলো ২০০২ সনে ভূপালে মুসলমানদের সমাবেশে (এস্তেমায়) ব্যর্থ বোমা হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল। সে স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীদের হত্যায় মামলায় যোশীর সহ-আসামী হিসেবে অভিযুক্ত।

সুধাকর ধর ত্রিবেদী ওরূপে দয়ানন্দ: পান্ডে, জম্মুতে শারদাপীঠ নামে একটি আশ্রম পরিচালনা করে। ২০০৮ সনে মালেগাঁও বোমা হামলায় জড়িতদের দীক্ষাগুরু হিসেবে সে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অভিনব ভারতের বৈঠকগুলোর বক্তব্য লেপটপ'এ ধারণ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয় ।

১৯৯২ সনে মুম্বাইয়ে ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে অধিকাংশই ভারতীয়দের মনে এমন স্বয়ংক্রিয় ও ক্ষতিকারক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রতিটি হামলার পিছনে মুসলমানদের হাত রয়েছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহও এমনি অমূলক ধারণার অংশীদার। প্রতিটি বোমা হামলার পরই সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করার জন্য মিডিয়া ও সরকারের পক্ষ থেকে তীব্র চাপের মুখে পুলিশ ধৈর্যের সাথে খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত ও পাকড়াও করতে যত্নশীল না হয়ে অমূলক ধারণার বশীভূত হয়ে মুসলিম যুবকদেরকে উগ্রবাদী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবী করে তাদেরকে সন্ত্রাসের অনুঘটক ও হোতা হিসেবে গ্রেফতার করে। উন্মাদনাগ্রস্থ ও উত্তেজনাক্রান্ত ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম পুরো ঘটনাকেই বলতে গেলে প্রভাবিত করে জনসাধারলেণ্য মুসলিম-বিরোধী প্রতিশোধ-প্রবণ মানসিকতা সৃষ্টিতে মারাত্মক ভূমিকা রাখে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ, হতাশা ও নৈরাশ্য

www.pathagar.com

প্রভৃতির সমন্বয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও সুশীল সমাজের কেউ কেউ এবং তেহেলকা'র মতো কোন কোন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য তেমন কোন ভারতীয়ই সাহস করেনি। সন্দীপ প্রয়াগ ও লেঃ কর্নেল পুরোহিতের গ্রেফতার মুসলিমদের দায়ী করার ধারণা কিছুটা হোঁচট খায়। স্বদেশে সৃষ্ট ইসলামী সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত তবে অসীমানন্দের অপরাধ স্বীকার করার জবানবন্দীটি বদ্ধমূল ভ্রান্তিজনিত অনারোগ্য ধারণা তথা মুসলিম-বিরোধী অমূলক পূর্ব-ধারণাপ্রসূত সন্দেহ অপনোদনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

তার (অসীমানন্দের) মতে, ২০০৬ সনে মালেগাঁও এবং ২০০৮ সনে সমঝোতা এক্সপ্রেসে; ২০০৭ সনে আজমীর শরীফে এবং ২০০৭ সনে মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের পেছনে মুসলিম যুবকরা নয় — বরং আর এস এস'এর একদল প্রচারকর্মী জড়িত ছিল। এ স্বীকারুক্তির দু'টো অস্বস্তিকর দিক রয়েছেঃ এসব বোমা হামলার ফলে কেবল কিছু নিরাপরাধ মানুষের মর্মান্তিক জীবনহানিই ঘটায়নি, বরং চিরাচরিত কৌশল অনুযায়ী শুধুমাত্র সন্দেহ ও অমূলক পূর্ব-ধারণায় প্রবৃত্ত হয়ে বশীভূত হয়ে ইন্টিলিজেন্ট ব্যুরো'র সহযোগিতায় অন্ধ্র প্রদেশ ও মহারাষ্ট্র পুলিশ অনেক মুসলিম যুবককে ধরে নিয়ে যায় এবং তারা নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ হয়। এভাবে অনেক মুসলিম যুবক বছরের পর বছর কারাভোগের পর নির্দোষ প্রমাণিত হয়। তবে অনেকেই এখনো কারাগারে দুঃসহ দিন কাটাচ্ছে। তাদের যৌবন তাদের ভবিষ্যত কারাগারেই নিঃশেষ হচ্ছে। তাদের পরিবার অভাব-অনটনের মুখে পড়ে ধ্বংস হচ্ছে।

মানব অভিজ্ঞার এক বিরল ও দুর্লভ ঘটনাচক্রে কারারুদ্ধ এসব মুসলিম যুবকদের সাথে অসীমানন্দের সাক্ষাত হয়, যেখানে তাদের (মুসলিম যুবকদের) অকারণ দুঃখ-দুর্দশা অসীমানন্দের বিবেক ও আবেগকে নাড়া দেয়, যা চূড়ান্ত পরিণতিতে এ মারাত্মক ভুল শুধরে দিতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। বিবেকের তাড়নায় সে তার দোষ স্বীকারের সিদ্ধান্ত নেয়। অসীমানন্দ বিচারককে বলেন, "মহামান্য আদালত হায়দারাবাদে চঞ্চলগুদা জেলা কারাগারে আমার সহ-

www.pathagar.com

কারাবন্দীদের মধ্যে একজন ছিল কালাম নামে এক মুসলিম যুবক। তার সাথে আলাপচারিতায় আমি জানতে পেরেছি যে, সে মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ মামলায় আমার আগেই গ্রেফতার হয়েছে। তাকে ইতোমধ্যেই দেড় বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছে। আমার কারাজীবনে কালাম আমার জন্য পানি, খাবারসহ অন্যান্য বস্তু এনে বিভিন্নভাবে আমার সেবা করতো। তার (কালামের) সদাচরণে আমি বিমোহিত হই। আমার বিবেক আমার অপরাধ স্বীকার করে জবানবন্দী দিয়ে আমাকে প্রায়শ্চিত করতে তাড়িয়ে বেড়ায়, যাতে সত্যিকার অপরাধীরা শাস্তি পায় এবং নির্দোষ-নিরাপরাধীরা মুক্ত হয়।"

এমন অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট তার স্টেনোগ্রাফারকে তার কক্ষ ত্যাগ করতে বলেন যাতে অসীমানন্দ বাধাহীনভাবে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী অব্যাহত রাখতে পারে।

নিজ হাতে হিন্দিতে লেখা ৪২-পৃষ্ঠার এ জবানবন্দীতে (যা' তেহেলকা কর্তৃপক্ষর হাতে এসেছে) অসীমানন্দ হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের গোপন কার্যক্রমের নেটওয়ার্ক খোলাসা করে দিয়েছে। তার মতে, বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য কেবল উগ্রবাদী গ্রুপ অভিনব ভারত' একাই দায়ী নয়, বরং আর এস এস'এর জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ইন্দ্রেস কুমার গভীর মনোযোগের সাথে আর এস এস'এর কিছু প্রচারকদের বাছাই করে সন্ত্রাসী হামলার জন্য অর্থায়িত করে।

অসীমানন্দ বিচারককে জানায়, "২০০৫ সনে ইন্দ্রেস সাবরি ধামে (গুজরাটের ডাঙ জেলায় অসীমানন্দের আশ্রম) সাক্ষাৎ করে। তার সাথে আর এস এস'এর অনেক উঁচুমাপের কর্মকর্তা ছিলেন। ইন্দ্রেস আমাকে বলল — বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো আমার (অসীমানন্দ) কাজ নয়। এর পরিবর্তে আর এস এস আমাকে আদিবাসীদের কল্যাণে মনোযোগী হবার দায়িত্ব দিয়েছে। সে বলল, এ কাজের (সন্ত্রাসী হামলা) জন্য সে সুনীল যোশীকে নিয়োগ করেছে। এবং এ কাজের জন্য যোশীকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হবে।" সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানোর জন্য ইন্দ্রেস যোশীকে কিভাবে অর্থায়িত করে এবং বোমা পাতার জন্য জনবলও যোগাড় করে দেয় অসীমানন্দ সেসব

www.pathagar.com

বিবরণও তার জবানবন্দীতে উল্লেখ করে। অসীমানন্দ নিজেও সন্ত্রাসী চক্রান্তে তার নিজ ভূমিকা, কিভাবে তারা একগুচ্ছ আর এস এস প্রচারক ও অন্যান্য হিন্দু উগ্রবাদীদের মালেগাঁও, হায়দারাবাদ ও আজমীরে সন্ত্রাসী হামলা চালাতে রাজী করিয়েছে তা' স্বীকার করে। (তেহেলকা'র পক্ষ থেকে ইন্দ্রিসের সাথে অনেকবার যোগাযোগ করে এ ঘটনার সাথে তার অবস্থান জানতে চাওয়া হয়। সে পরে ফোন করবে এমন আশ্বাস দেয়া সত্বেও কখনোই ফোন করে নি।)

প্রত্যেকটি নতুন নতুন গ্রেফতারের সাথে সাথে মক্কা মসজিদ ও আজমীরে বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে আর এস এস প্রচারকদের জড়িত থাকার প্রমাণাদি বেরিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে অসীমানন্দের স্বীকারোক্তি ছিল ২০০৬ সনে মালেগাঁও এবং সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণে হিন্দু মৌলবাদী জঙ্গীদের জড়িত থাকার প্রথম সরাসরি প্রমাণ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আলামত একত্রিত করে সিআইবি দেখতে পায় যে, মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে টার্গেট করে ব্যাপক চক্রান্ত ২০০১ সন থেকেই আঁটা হয়।

মধ্যপ্রদেশের তিনজন প্রচারক — সুনীল যোশী, রামচন্দ্র কালচানগ্রা ও সন্দীপ ডাঙে ছিল বাহ্যতঃ এ চক্রান্তের মধ্যমনি। এই তিন ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ব্যাপারে দুবির্নীত হয়ে ওঠার কারণে তাদের সন্ত্রাসী অভিলাষ বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে তারা অন্যান্য রাজ্য প্রধানতঃ মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান থেকে তাদের সমমনা উগ্রবাদীদের সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেয়। নবাগতদের অধিকাংশই আর এস এস, বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হলেও অভিনব ভারত, জয় বন্দে মাতারম ও ভানভাসী কল্যাণ আশ্রম প্রভৃতি সংগঠন থেকেও আসে।

অবশ্য সুনীল যোশী, রামচন্দ্র কালচানগ্রা ও সন্দীপ ডাঙে বাইরের অন্যান্য গ্রুপ থেকে আসা সদস্যদেরকে অনেক বিষয়ে বিস্তারিত জানাতো না। 'প্রয়োজন অনুযায়ী জানা' — দায়িত্ব বিভক্তির এমন কঠোর নীতি যোশী কঠোরভাবে অনুসরণ করতো। প্রত্যেক কর্মী কোন কাজের কেবল তার অংশটুকুই জানতো, এর বেশী নয়।

www.pathagar.com

অসীমানন্দ দাঙেতে ভানভাসী কল্যাণ আশ্রম চালাতো। ২০০৩ সনে সে সুনীল যোশীর সংস্পর্শে আসে। ২০০৬ সনের দিকে সে সন্ত্রাসী চক্রান্তের সাথে স্বকীয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে।

মহারাষ্ট্র এ টি এস'এর প্রধান হেমান্ত্ম কারকারি (Karkare) ২০০৮ সনে মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপক তদন্তের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বোমা বিস্ফোরণের সাথে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী চক্রান্তের ঢাক্না সর্বপ্রথম উন্মোচন করেন। কারকারি ও লেঃ কর্নেল পুরোহিতসহ মোট ১১জন হিন্দত্ববাদীকে গ্রেফতার করেন। পুরোহিত সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার নাসিক শাখায় কর্মরত ছিল। স্বঘোষিত ধর্মীয় গুরু দয়ানন্দ পান্ডে জম্মুতে 'সারদা পীঠ' (Peeth) নামে একটি আশ্রম চালাতো এবং অভিনব ভারত'এর নেত্রী সাধ্বী প্রজ্ঞা ২০০৮ সনে মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণে বিশেষ ভূমিকার জন্য যোগী বা তাপস্বীতে পরিণত হয়।

কিন্তু ২৬/১১তে মুম্বাই'এ মুসলিম মৌলবাদীদের সন্ত্রাসী হামলায় কারকারি অকস্মাৎ ও দুর্ভাগ্যজনকভাবে খুন হওয়ায় সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্ত তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়। মহারাষ্ট্র এ টি এস'এর নতুন প্রধান কে পি রগুবংশী রামচন্দ্র কালসানগ্রা ও সন্দীপ ডাঙেকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে তিনি তাদেরকে সন্ত্রাসী হামলায় ছোটখাট ভূমিকার অজুহাত দাঁড় করিয়ে অভিযোগপত্র (সার্জশীট) হতে তাদের নাম বাদ দেন।

আজমীর বোমা বিস্ফোরণ মামলায় রাজস্থান এ টি এস ২০১০ সনের মে মাসে রাজস্থান এটিএস আর এস এস প্রচারক দেবেন্দ্র গুপ্ত ও লোকেশ শর্মাকে গ্রেফতার করার সাথে সাথে তদন্ত পুনরায় নতুন গতি লাভ করে। গুপ্ত ছিল বিহারের মুজাফ্ফরনগর বিভাগের আর এস এস'এর প্রচারক। সে যোশী, কালচানগ্রা ও ডাঙেকে কৌশলগত সমর্থন প্রদান করে এবং গোয়েন্দা সংস্থা তাড়া করার সময় শেষোক্ত দুইজনকে আর এস এস অফিসে আশ্রয় দেয়।

যোশীর সাথে আর এস এস কর্মী লোকেশ শর্মার বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সে দুটো নকিয়া ফোন ক্রয় করে যেগুলো মক্কা মসজিদ ও আজমীর শরীফে বোমা বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয়। শর্মাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রথমবারের মতো

www.pathagar.com

প্রকাশ পায় যে, আর এস এস'এর জাতীয় নির্বাহী সদস্য ইন্দ্রেস কুমার সন্ত্রাসী চক্রান্তের মূল ব্যক্তিবর্গের একজন। রাজস্থান এ টি এস এবং সি বি আই'এর যৌথ তদন্তে বেরিয়ে আসে যে, মহারাষ্ট্র এ টি এস কর্তৃক ২০০৮ সনে গ্রেফতারকৃত প্রজ্ঞা (Pragya) সিং ঠাকুর ব্যতীত বাদবাকী সবাই সন্ত্রাসী চক্রান্তের সাথে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে সন্ত্রাসী তৎপরতার মূল হোতা হলো ইন্দ্রেস কুমার, কালচানগ্রা ও ডাঙে।

২০১০ সনের জুনে সি বি আই অসীমানন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী গুজরাটের ভলছাদ জেলার বাসিন্দা ভারত রিতেশ্বর নামক জনৈক সাক্ষীকে জেরা করে। রিতেশ্বর সি বি আই'কে বলেছে সুনীল যোশী ইন্দেস'এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং সন্ত্রাসী হামলা চালানোর ক্ষেত্রে তার অনুমোদন ও কৌশলগত (লজিস্টিক) সমর্থন ছিল।

২০১০ সনের ১৯ নভেম্বর সি বি আই হরিদ্বারে একটি গোপন আস্তানায় অভিযান চালিয়ে স্বামী অসীমানন্দকে গ্রেফতার করে। এর আগে অসীমানন্দ ২০০৮ সনের অক্টোবরে সাধ্বী প্রজ্ঞা গ্রেফতার হবার পর হতে দু'বছরের বেশী সময় পলাতক ছিল। তার গ্রেফতারে অনেক গোপন তথ্য বেরিয়ে আসে।

নব কুমার ওরূপে স্বামী অসীমানন্দ পশ্চিম বাংলার হুগলি জেলার কামারপুকার গ্রামের অধিবাসী। ১৯৭১ সনে হুগলি থেকে বিএস সি (সম্মান) পাশ করে সে বর্ধমান জেলায় বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পড়তে যায়। স্কুল জীবন থেকে আর এস এস কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকলেও স্নাতকোত্তর অধ্যয়নকালীন নব কুমার আর এস এস'এর সক্রিয় সদস্যে পরিণত হয়। ১৯৭৭ সন থেকে সে পুরুলিয়া ও বাকুড়া জেলায় আর এস এস-চালিত ভানভাসী কল্যাণ আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আর এস এস'এর সার্বক্ষণিক কাজ শুরু করে। ১৯৮১ সনে নব কুমারের গুরু স্বামী পরমানন্দ তাকে স্বামী অসীমানন্দ উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৮৮ সন থেকে ১৯৯৩ সন পর্যন্ত সে আন্দামন ও নিকোবারে দ্বীপপুঞ্জে ভানভাসী কল্যাণ আশ্রমে কর্মরত ছিল। ১৯৯৩ ও ১৯৯৭ সনে আদিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় বাণী প্রচার করার জন্য সে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে । ১৯৯৭

www.pathagar.com

সনে সে গুজরাটের ডাঙ্গস (Dangs) জেলায় বসতি স্থাপন করে সার্বী (Shabri) ধাম নামে আদিবাসী কল্যাণ সংস্থা চালু করে। চরম সংখ্যালঘুবিরোধী বক্তব্য এবং খ্রিস্টান মিশনারীর বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচারণার জন্য সে তার এলাকায় সুখ্যাতি (?) অর্জন করে।

অসীমানন্দকে আর এস এস নেতৃত্বের সাথে ঘনিষ্ঠ বলে মনে করা হতো। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, সাবেক আর এস এস প্রধান কে এস সুন্দরাম ও মোহন ভগত প্রমূখ তার প্রতিষ্ঠিত সার্বী ধামে ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন।

আপন অপরাধ স্বীকারোক্তি অনুসারে অসীমানন্দ সংখ্যালঘু-বিরোধী দৃঢ় অবস্থানের জন্য পরিচিত ছিলেন।

অসীমানন্দের অভিযোগ, "২০০২ সনে আকসারধাম মন্দিরে ইসলামপন্থীদের হিন্দু ধর্মানুরাগীদের নিন্দনীয় হত্যার পর তার মধ্যে সন্ত্রাসের প্রতিশোধ নেয়ার তীব্র আগুন জ্বলে ওঠে। "মুসলিম সন্ত্রাসীরা হিন্দু মন্দিরে আক্রমণ শুরু করে," অসীমানন্দ জানায়। "এটা আমার মনে তীব্র উদ্বেগ ও ক্ষোভ সৃষ্টি করে। মুসলিম সন্ত্রাস-জনিত উদ্বেগের বিষয়টি নিয়ে আমি প্রায়ই ভালসাদস্থ ভারত রিতেশ্বর'এর মত বিনিময় করতাম।"

২০০৩ সনে অসীমানন্দ সুনীল যোশী ও প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর'এর সংস্পর্শে আসে। সে প্রায়ই তাদের সাথেও ইসলামী সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে কথা বলত। তার ভাষ্যমতে ২০০৬ সনের মার্চ মাসে বারনশী সংকটমোচন মন্দিরে সন্ত্রাসী হামলা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের ঝল্‌ছে ওঠার প্রকৃত কারণ।

"২০০৬ সনের মার্চ মাসে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, সুনীল যোশী, ভারত রিতেশ্বর ও আমি সংকটমোচন বোমা বিস্ফোরণের যথোপযুক্ত জবাব দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই," অসীমানন্দ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানায়।

অসীমানন্দ যোশীকে বোমা বিস্ফোরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ভারতীয় মুদ্রা ২৫ হাজার রূপী প্রদান করে। সে এ ব্যাপারে সহযোগিতা চাইতে যোশী ও হিতেশ্বরকে লোকসভার উগ্রবাদী সদস্য যোগী আদিত্যনাথের কাছে পাঠায়। ২০০৬ সনের এপ্রিল মাসে যোশী মুসলিম-

www.pathagar.com

বিরোধী ক্ষুব্ধ বক্তৃতার জন্য কুখ্যাত আদিত্যনাথ'এর সাথে বাহ্যতঃ গোপনে বৈঠক করে। তবে অসীমানন্দ বলেছে, যোশী ফিরে এসে আমাকে জানায় যে, আদিত্যনাথ তেমন সাহায্যে আসেনি।" অবশ্য এটা অসীমানন্দকে তেমন বিব্রত বা বাধাগ্রস্থ করতে পারে নি। সে তার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যায়।

অসীমানন্দ ২০০৬ জুন মাসে রিতেশ্বর'এর ভালসাদস্থ বাসভবনে রিতেশ্বর, প্রজ্ঞা সিং ও যোশীর সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ করে। এই বৈঠক মূলতঃ নিষ্প্রভ হলেও এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ বৈঠকে প্রথমবারের মতো যোশী তার চার সহযোগী — দাঙে, কালচানগ্রা, লোকেশ শর্মা ও অশোক ওরূপে অমিতকে তার সাথে এনেছিল।

"আমি সবাইকে বলেছি যে, বোমার জবাব বোমার মাধ্যমে দিতে হবে (বোম কা জওয়াব বোম চে দে'না চাহিয়ে)," অসীমানন্দের স্বীকোরুক্তি। "ঐ সভায় আমি বুঝতে পেরেছি যে, যোশী ও তার গ্রুপ কিছু একটা করছে।"

"যৌথ সভার পর" অসীমানন্দ বলেছে, "যোশী, প্রজ্ঞা, রিতেশ্বর ও আমি ভিন্ন সভায় মিলিত হই। আমি পরামর্শ দিয়েছি যে, মালেগাঁও'এর শতকরা ৮০ ভাগ অধিবাসী মুসলমান। সুতরাং প্রথম বোমা বিস্ফোরণ মালেগাঁও'তে হওয়া উচিত। আমি আরো বলেছি যে, উপমহাদেশ বিভক্তির সময় হায়দারাবাদের নিযাম পাকিস্তানের সাথে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। সে হিসেবেও হায়দারাবাদ বিশেষ লক্ষ্যবস্তু হয়ে রয়েছে। তারপর আমি বললাম যে, যেহেতু আজমীর শরীফ দরগায় বিপুল সংখ্যক হিন্দুও জড়ো হয়, তাই আমাদের উচিত আজমীরেও বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো, যা' দরগাতে হিন্দুদের যাতায়াত বন্ধ করতে সাহায্য করবে। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কেও সন্ত্রাসী টার্গেট হিসেবে ধরতে হবে।" অসীমানন্দের ভাষ্যমতে, এসব স্থানকে টার্গেট (লক্ষ্যবস্তু) হিসেবে মেনে নেয়।

অসীমানন্দ জানায়, "ঐ সভায় যোশীর পরামর্শ ছিল যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলাচলকারী সমঝোতা এক্সপ্রেসে মূলতঃ পাকিস্তানীরাই ভ্রমণ করে। সুতরাং আমাদের উচিত ঐ ট্রেনেও হামলা চালানো। যোশী নিজে সমঝোতা এক্সপ্রেসে হামলার দায়িত্ব নেয় এবং দাঙে বোমা হামলার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করবে বলে জানায়।"

www.pathagar.com

ঘৃণা ও ক্ষোভ ধৈর্য্যের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে

অসীমানন্দের স্বীকারোক্তিতে লোমহর্ষক কাহিনী বিস্তারিতভাবে বেরিয়ে আসে। "যোশী বলেছিল, তিনটি টিম বিস্ফোরণের কাজটি সম্পন্ন করবে। একটি গ্রুপ প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোজিস্টিক সার্পোট যোগাড় করবে। দ্বিতীয় টিম বিস্ফোরকদ্রব্যের ব্যবস্থা করবে। এবং তৃতীয় টিম বোমা পাতার দায়িত্ব পালন করবে। সে আরো বলেছে যে, এক টিমের সদস্যরা অন্য দু'টি টিমের সদস্যদের চেনা উচিত নয়, যাতে কেউ গ্রেফতার হলৌ অন্যরা নিরাপদে থাকে," অসীমানন্দ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানায়।

৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৬, বিকেল ১.৩০ মিনিটে সাম্প্রদায়িকভাবে উপ্তত্ত মহারাষ্ট্রের মেলাগাঁও শহরে চারটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। ঐদিন ছিল শুক্রবার এবং এছাড়া ঐ দিনই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ববহ মুসলমানদের শবে বরাত পালিত হচ্ছিল। হামিদিয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে ও বাদা কবরস্থানে তিনটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। চতুর্থ বোমাটি বিস্ফোরিত হয় মুসাওরাত চকে।

তিনটি বোমার মধ্যে একটি পাতা হয়েছিল বাদা কবরস্থান ও হামিদিয়া মসজিদের প্রবেশ পথে। দ্বিতীয় বোমাটি মসজিদের পার্কিং লটে একটি বাইসাইকেলে রাখা ছিল। আর তৃতীয় বোমাটি মসজিদ আঙ্গিনায় বিদ্যুত সরবরাহ কক্ষের দেয়ালের সাথে লটকানো ছিল। চতুর্থ বোমাটি জনাকীর্ণ মুসাওরাত চক জংশনে বিস্ফোরিত হয়। এ বোমাটি একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে রাখা একটি বাইসাইকেলে রাখা হয়েছিল। বোমা বিস্ফোরণের বিষয় ছিল সুপরিকল্পিত এবং বোমাগুলো মুহূর্তের ব্যবধানে পর পর বিস্ফোরিত হয়। ফলে ৩১ জন মুসলমান নিহত ও ৩১২ জন আহত হন।

সন্দেহবিদ্ধ তড়িগড়ি তদন্তে মহারাষ্ট্র এ টি এস ৯০ দিনে মধ্যে মেলাগাঁও'এর নয়জন মুসলিমকে বোমা বিস্ফোরণের জন্য আসামী করে। এদের মধ্যে আটজনই নিষিদ্ধ ঘোষিত কথিত উগ্রবাদী সংগঠন ভারতীয় মুসলিম ছাত্র আন্দোলন (SIMI — Students Islamic Movement India) 'এর সদস্য। মালেগাঁও'এর অন্য তিনজন মুসলিমকে পলাতক দেখানো হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের নিবর্তণমূলক [Maharashtra Control of Organised

www.pathagar.com

Crime Act (MCOCA)] কঠোরতম আইনের আওতায় মামলা হয়।

২১ আগষ্ট (২০০৬) এ টি এস নয়জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের দিনই মহারাষ্ট্র সরকার সি বি আই'কে তদন্তের দায়িত্ব নেয়ার আহ্বান জানায়। বাস্তবে সি বি আই'কে তদন্ত শেষ হওয়া এবং তথাকথিত সুরাহা হওয়া ও চার্জশীট দেয়া আসামীদের তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এক বছর আগে ২০১০ সনের প্রথম দিকে সি বি আই একটি পরিপূরক চার্জসীট দাখিল করেছিল। কিন্তু তারাও কোন গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আলামত উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। চার বছরেরও বেশী সময় ধরে মেলাগাঁও'এর এ নয়জন মুসলিম যুবক কারাগারে দুঃসহ সময় অতিবাহিত করছে। অসীমানন্দের স্বীকোরুক্তি এখন প্রমাণ করছে এরা সম্পূর্ণ নির্দোষ । প্রকৃত অপরাধী এবং তাদের হোতাদের আড়াল করে কেবলমাত্র সমালোচনা এড়াতে মিথ্যে ধারণার ভিত্তিতে এদেরকে গ্রেফতার করে সাধারণ ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত এমন মিথ্যে বিশ্বাস জন্মানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল যে, গ্রেফতার করে বোমা হামলার মামলার সুরাহা করা হয়েছে। অসীমানন্দের স্বীকারোক্তি অনুসারে সুনীল যোশী হলো এ হামলার প্রকৃত হোতা। এবং অসীমানন্দ নিজেই মেলাগাঁওতে বোমা হামলা চালানোর জন্য সুনীল যোশীকে প্ররোচিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এসব কথাই, যা' অসীমানন্দ ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিল: "২০০৬ সনে দেয়ালী উপলক্ষে যোশী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে সার্বি ধামে আসে। ইতোমধ্যেই মালেগাঁওতে বোমা হামলা হয়েছে। সুনীল বলেছিল, আমাদের লোকরাই এ হামলা চালিয়েছে। আমি বললাম, সংবাদপত্র প্রতিবেদন মতে, মুসলিম যুবকরাই বোমা হামলার সাথে জড়িত ছিল এবং এদের ক'জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সুনীল আমাকে নিশ্চিত করেছে যে, এ হামলা সে-ই ঘটিয়েছে। কিন্তু আমাদের যেসব লোক এ হামলা চালিয়েছিল সে তাদর পরিচয় জানাতে অস্বীকার করে।"

ভারতের সাথে শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোরশেদ কোরেশীর ভারত সফরের প্রাক্কালে ২০০৭ সনে ১৮ ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে দিল্লী

www.pathagar.com

ও লাহোরের মধ্যে চলাচলকারী পাকিস্তানগামী সমঝোতা এক্সপ্রেসের দু'টি বগি দু'টি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে উড়ে যায়। দিল্লী থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে পানিপথের কাছে দিওয়ানা নামক স্থানে পৌঁছলে দুটো কোচ নরকে (inferno) পরিণত হয়। তৃতীয় আরেকটি বোমা অন্য একটি বগিতে বসানো থাকলেও সেটা ভাগ্যক্রমে বিস্ফোরিত হয়নি। দুটো বগির ৬৮ জন যাত্রী এ হামলায় নিহত এবং বহু সংখ্যক আহত হন। এতে শান্তি আলোচনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তদন্তে দেখা গেছে যে তিনটি বগিতে তিনটি স্যুটকেস রাখা হয়— যেগুলোতে ডেটোনেটর, টাইমগড়ি (timers), লোহার তার, বিস্ফোরক এবং বোতলভর্তি পেট্রোল ও কেরোসিনে ভর্তি ছিল।

অনতিবিলম্বে সন্দেহের তীর পাকিস্তানী উগ্রবাদীদের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হয়। এর ভিত্তিতে যাকে আপনারা তদন্তকারী সংস্থা হিসেবে চেনেন, তারা পাকিস্তান-ভিত্তিক হরকাতুল জিহাদ ও লস্কর-ই-তাইয়েবাকে বোমা হামলার জন্য দায়ী করে। এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এ বোমা হামলার জন্য যৌথভাবে হরকাতুল জিহাদ (হুজি) ও লস্কর-ই-তাইয়েবাকে দায়ী করে। হরিয়ানা পুলিশ বোমায় ব্যবহৃত কিছু উপাদান ইন্দোরের একটি বাজার থেকে কেনার তথ্য উদঘাটন করে, কিন্তু এ নিয়ে তদন্ত এক সময় হিমাগারে চলে যায়।

২০০৮ সনের নভেম্বর মাসে মহারাষ্ট্র এ টি এস নাসিক'এর এক আদালতে বলেছিল যে, লেঃ কর্নেল পুরোহিত ২০০৬ সনে জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৬০ কেজি আরডিএক্স (RDX) সংগ্রহ করে। এমন সন্দেহ করা হয় যে, এ বিস্ফোরকের একটা অংশ সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা হামলার দুষ্কর্মে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এ টি এস পরবর্তীকালে এমন সন্দেহের অনুকূলে কোন আলামত উপস্থাপন করতে পারে নি। ফলে মহারাষ্ট্র এ টি এস তার দাবী থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। হরিয়ানা পুলিশ বোম্বাইতে গিয়ে পুরোহিত ও মেলাগাঁও বোমা হামলা মামলার অন্যান্য আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু এমন কোন তথ্য-প্রমাণ উদ্ধার করতে পারে নি, যাতে সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা হামলার সাথে আসামীদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

www.pathagar.com

২০১০ সনের জুলাই মাসে সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা হামলার তদন্তভার জাতীয় তদন্ত সংস্থার [National Investigating Agency (NIA)] কাছে হস্তান্তর করা হয়। এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু অমীমাংশিত বিষয়ের সাথে অসীমানন্দের প্রদত্ত স্বীকোরুক্তি আরো কিছু নতুন প্রশ্ন যোগ করে।

২০০৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অসীমানন্দ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছে, "রিতেশ্বর ও যোশী মোটর সাইকেল যোগে বোলপুর নামক স্থানে অবস্থিত ভগবান শিব মন্দিরে আসে। যেহেতু ঐ স্থানটি আমাদের সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত ছিল বিধায় আমি তাদের আগেই ওখানে পৌঁছে তাদের আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। যোশী আমাকে বলল, পরবর্তী দু'দিনের মধ্যে বেশ ভাল খবর পাওয়া যাবে, আমি যেন খবরের কাগজের ওপর নজর রাখি। সাক্ষাতের পর আমি শার্বি ধামে ফিরে যাই। আর যোশী ও রিতেশ্বর তাদের আসা পথেই ফিরে যায়। দু'দিন পর আমি রিতেশ্বরের সাথে দেখা করার জন্য তার বালসাদস্থ বাসভবনে গেলাম। যোশী ও প্রজ্ঞা আগে থেকেই সেখানে অবস্থান করছিল। ইতোমধ্যেই সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। আমি যোশীকে জিজ্ঞেস করলাম, এতো দূরে হরিয়ানায় সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ইতোমধ্যেই ঘটে যাবার সময় সে কিভাবে ওখানে উপস্থিত ছিল। যোশী উত্তরে বলল, তার লোকেরাই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।"

"একই বৈঠকে" অসীমনান্দ জানায়, "হায়দারাবাদে বোমা বিস্ফোরণের জন্য যোশী আমার কাছ থেকে ৪০ হাজার রূপী নেয়। ক'মাস পর যোশী ফোন করে আমাকে বলে যেহেতু কিছু ভাল খবর আসছে, তাই আমি যেন খবরের কাগজে চোখ রাখি। কিছুদিনের মধ্যেই মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটে। এর ৭/৮ দিন পর যোশী একটি তেলেগু (ভাষা) দৈনিক নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়। ঐ পত্রিকায় মক্কা মসজিদ বোমা বিস্ফোরণের একটি ছবি ছিল। আমি যোশীকে বললাম খবরের কাগজের ছবিতে কিছু মুসলিম যুবককে বিস্ফোরণের দায়ে গ্রেফতার করার খবর এসেছে। কিন্তু যোশী বলল, তার লোকেরাই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।"

২০০৬ সনে ঘটে যাওয়া মেলাগাঁও বিস্ফোরণের মতোই ২০০৭ সনের ১৭ মে

www.pathagar.com

শুক্রবার মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটে। বেলা দেড়টার দিকে পুরাতন হায়দারাবাদের চরমিনার এলাকায় অবস্থিত মক্কা মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায়ের জন্য প্রায় চার হাজার মুসুল্লি উপস্থিত ছিলেন। ঠিক এ সময়ে মসজিদের ভেতর অজুখানার কাছে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়।

আরেকটি বিস্ফোরক (IED — improvised explosive device) একটি নীল রেকসিনের ব্যাগে মসজিদের উত্তর দিকের প্রবেশ পথে টাঙানো ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে বোমাটি বিস্ফোরিত হয় নি।

তদন্ত দলের কাছে বোমা বিফোরণের কোন গ্রহণযোগ্য আলামত অথবা প্রমাণ না থাকা সত্বেও হায়দারাবাদ পুলিশ নিন্দিত পন্থায় গণহারে কট্টর সুন্নীমতের অন্তর্ভূক্ত আহলে হাদিস'এর অনুসারী মুসলিম যুবকদের গ্রেফতার অভিযানে ঝাপিয়ে পড়ে। আহলে হাদিস'এর অনুসারীরা কট্টর মৌলবাদী সুন্নি মুসলিম হিসেবে পরিচিত। উগ্রবাদী হিসেবে পরিচিত শহীদ বেলালের মতো কোন কোন স্থানীয় মুসলিমদের পরিবারের সদস্য ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদেরকেও গ্রেফতার করা হয়। দু'সপ্তাহের মধ্যে তিন ডজনের বেশী মুসলিম যুবককে মালাকপেট ও সায়েদাবাদ থেকে তুলে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। কিন্তু মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করার মতো কোন প্রমাণ না পেয়ে পুলিশ তাদেরকে আটক রাখার জন্য তাদের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মিথ্যে ও ভূয়া মামলা দায়ের করে ।

২০০৭ সনের ৯ জনু সি বি আই মক্কা মসজিদ মামলা তদন্তের দায়িত্ব নেয়। ক'মাস পর, ২০০৭ সনের ১১ অক্টোবর (তখন মুসলমানদের রমজান মাস চলছিল) সন্ধ্যে ৬.১৫ মিনিটের দিকে মুসুল্লিরা আজমীর শরীফ দরগায় ইফতার করছিলেন। এ সময় মসজিদ প্রাঙ্গনে একটি গাছের কাছে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে তিনজন মুসলিম নিহত ও অন্য বেশ ক'জন আহত হন। তদন্তকারীরা আরো একটি অবিস্ফোরিত বোমা [IED] খুঁজে পেয়েছিল।

অসীমানন্দের জবানবন্দী অনুযায়ী, ইন্দ্রেসের নিয়োজিত মুসলিম যুবকরাই এ বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। "আজমীরে বোমা বিস্ফোরণের দু'দিন পর যোশী

www.pathagar.com

আমার সাথে দেখা করতে আসে। তার সাথে রাজ ও মেহুল নামক আরো দু'জন ছিল। এরা এর আগেও শার্বি ধাম দেখতে এসেছিল। যোশী দাবী করে যে, তার লোকেরা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল এবং ঐ সময়ে সে (যোশী) নিজেও দরগা'র ভেতরে ছিল। সে জানায় বোমা পাতার জন্য ইন্দ্রেস তাকে দু'জন মুসলিম যুবক দিয়েছিল। আমি ইন্দ্রেসকে জিজ্ঞেস করলাম যদি মুসলিম যুবকরা ধরা পড়ে, তবে ইন্দ্রেসের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যাবে। আমি যোশীকে আরো বলেছি, ইন্দ্রেস তাকে (যোশী) খুন করাতে পারে। আমি তাকে শার্বিধামে থেকে যেতে বললাম। যোশী জানায় বরোদা বেস্ট বেকারী মামলায় পুলিশ রাজ ও মেথুলকে খুঁজছে। (উলেখ্য, ২০০২ সনে বরোদা বেস্ট বেকারীতে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গায় ১২ জন মুসলিম যুবক নিহত হন)। আমি যোশীকে বললাম, রাজু ও মেথুলকে আশ্রমে রাখা নিরাপদ হবে না, যেমন নিরাপদ নয় তাদের গুজরাটে থাকা। পরের দিন যোশী তাদের দু'জনকে নিয়ে দেয়াসের [Dewas] উদ্দেশ্যে চলে যায়।"

দু'মাসেরও কম সময় পর ২০০৭ সনের ২৯ ডিসেম্বর আচমকা ঘটনায় অসীমানন্দের ভীতি-সঞ্জাত সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হলো। সুনীল যোশী মধ্য প্রদেশে দেওয়াস্থ তার বাসার বাইরে খুন হলো। তার পরিবার থেকে দাবী করা হলো তার সংগঠনেরই লোকেরাই তাকে হত্যা করেছে। প্রজ্ঞা ঠাকুর গ্রেফতার হবার পর সেও তাকে (যোশী) একই পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু মধ্য প্রদেশ পুলিশ এ মামলা সুরাহা করতে ব্যর্থ হয়ে মামলাটি বন্ধ করার জন্য প্রতিবেদন [closure report] আদালতে দাখিল করে।

অবশেষে নতুন পদক্ষেপ হিসেবে ২০১০ সনের ডিসেম্বরের শেষ দিকে মধ্য প্রদেশ পুলিশ এ মর্মে মামলাটি গ্রহণ করে যে, আর এস এস'এর সহযোগীদের হাতেই যোশী খুন হয়েছে। পুলিশ এ খুনে জড়িত থাকার জন্য পুলিশ গুজরাট হতে মায়ানক, হারশাদ সোলানকি, মেহুল ও মোহনকে; ইন্দোর হতে আনন্দ রাজ কার্তিকে, দেয়াস হতে বাসুদেব পারমারকে অভিযুক্ত করে। মেহুল ও মোহন পলাতক থাকলেও সোলানকিকে দেয়াস কোর্টে হাজির করা হয়। আদালতে সে যোশীকে হত্যার অপরাধ স্বীকার করে। এ সব

www.pathagar.com

গ্রেফতার পরেও পুলিম খুনের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হয়। পুলিশ দাবী করেছে যে, হত্যার মূল কারণ খুনীদের দলীয় কোন্দল। অন্যদিকে সি বি এ'এর মতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পরিণতিতে যোশীকে স্তব্ধ করার জন্য এ হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছে। বাস্তব কারণ হলো যোশী হিন্দু সন্ত্রাসীদের কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক খবর রাখত এবং এতে তার মুরুব্বীরা তাদের সব গোপন চক্রান্ত ও তৎপরতা প্রকাশ হবার আতঙ্কে ভুগছিল। যোশী খুন হওয়ায় অনেক প্রশ্নের জবাব অজানা থেকে যায়।

সে যদি সন্ত্রাসী চক্রান্তের মূল হোতা হয়ে থাকে, যা গ্রেফতারকৃতরা তাদের বক্তব্যে স্বীকার করেছে, তবে তার সহযোগীরা কেন তাকে সরিয়ে দেবে। সে যদি ইন্দ্রেস কুমারের পোষ্য হয়ে থাকে, তাদের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী কাজ করে থাকে, তার প্রভু তাকে কেন মৃত দেখতে চেয়েছিল? কোন বিষয়টি তাদের সম্পর্কের ছিড় ধরিয়েছিল কিংবা তাদের মধ্যে কহল সৃষ্টি করেছিল । এ হত্যাকান্ড দলের মধ্যে অস্পষ্ট ও অপ্রকাশ্য ভয়ঙ্কর উপদলীয় কোন্দলের ইঙ্গিত দেয়।

যোশী নিহত হবার প্রেক্ষাপট এবং বোমা হামলার ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে যোশীর বক্তব্য যা' অসীমানন্দের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে প্রকাশ পেয়েছে, তা' কোন কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্ট অসম পরিণতি বলে মনে হয়। তবে ঐ হত্যাকান্ডের গোলক-ধাঁধায় কেবল সে-ই একমাত্র সাক্ষী নয়। তার স্বীকোরুক্তি নিঃসন্দেহে বেশ জোরালো, কেননা তা' হিন্দুত্ববাদী প্রচারক নেট ওয়ার্কের ভেতরের খবরও সামনে নিয়ে আসে। সে কেবল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্তই ছিল না, বরং পলাতক থাককালীন এ চক্রের বিভিন্ন আখড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে এবং আশ্রয় নিয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করেন, কালচানগ্রা ও দাঙে গ্রেফতার হলে এ ধাঁধার অনেক অজ্ঞাত তথ্য বেরিয়ে আসবে।

যোশীর মৃত্যুর মানে এ নয় যে, উগ্রবাদী ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ইতি ঘটেছে। আর এস এস পন্থীদের সমন্বয়ে সে যে সন্ত্রাসী কাঠামো গড়ে তুলেছে, তাদের তৎপরতা বহুদিন ধরে অব্যাহত থাকতে পারে।

অসীমানন্দ তার স্বীকোরুক্তিতে বলেছে, সে ২০০৭ সনের জানুয়ারী মাসে

www.pathagar.com

রহস্যাবৃত উগ্রবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন অভিনব ভারত'এর সংস্পর্শে আসে। কর্নেল পুরোহিত ছিল এই সংগঠনের অন্যতম পুরোধা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। অসীমানন্দ তার স্বীকোরুক্তিতে স্বীকার করেছে যে, সে ২০০৮ সনে এপ্রিলে ভূপালে অনুষ্ঠিত অভিনব ভারত'এর এক বৈঠকে আরো বেশী সন্ত্রাসী হামলা চালানোর প্রস্তাব উত্থাপন করে। স্বাধ্বী প্রজ্ঞা, ভারত রিতেশ্বর, কর্নেল পুরোহিত ও দয়ানন্দ পান্ডে ঐ সভায় উপস্থিত ছিল। অসীমানন্দ ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছে, "আমি অভিনব ভারতের বহু সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং আরো অধিক সংখ্যায় বোমা হামলা চালানোর প্রস্তাব রেখেছি।"

২০০৮ সনের ২৯ সেপ্টেম্বর আবার সন্ত্রাসী হামলা ঘটে। মুসলমানদের পবিত্র রমজান মাসে মুসলিম অধ্যুষিত মেলাগাঁও'এর ভিক্ষুচকে IED সমন্বিত বোমা বিস্ফোরিত হয়। বোমাটি সিমি'র (Students Islamic Movement in India) কার্যালয়ের সামনে তালা লাগানো একটি মোটর সাইকেল লুকানো ছিল। মুসলিম সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে যে বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এটা একটা স্বীকৃত প্রবাদে পরিণত হয়েছিল যে, প্রতিটি বোমা হামলার পেছনে সিমি জড়িত। এ ধারণা বা দাবীর জন্য কোন ধরনের প্রমাণের প্রয়োজন পড়েনি। সুতরাং সিমি'র কার্যালয়ের সম্মুখে বোমা পেতে রাখা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ভয়ঙ্কর কর্মকান্ডের প্রতীক।

প্রায় একই সময়ে মেলাগাঁও থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত গুজরাটের মোদাসা নামক একটি ছোট শহরে একই ধরনের বোমা হামলা ঘটে। মেলাগাঁও'এর মতোই বোমাটি শুক্কা বাজার নামক মুসলিম কলোনী'এর একটি মসজিদের বাইরে বিস্ফোরিত হয়, যখন মুসলিম মুসল্লিরা রমজানের তারাবীর নামায পড়ছিলেন। মেলাগাঁওয়ের মতোই এখানেও বোমাটি একটি মটর সাইকেলে রাখা ছিল। মেলাগাঁও এবং শুক্কা বাজার মুসলিম কলোনী মসজিদের বোমা দু'টি পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে বিস্ফোরিত হয়।

মেলাগাঁও বিস্ফোরণে তিন বছরের একজন শিশুসহ সাতজন মুসলিম নিহত হন। মোদাসা বিস্ফোরণে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরের মৃত্যু ঘটে এবং অনেকেই আহত হন।

www.pathagar.com

এটা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার একটা বদ্ধমূল পক্ষপাতিত্ব যে, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ও মসজিদে মরণাক্তক বোমা বিস্ফোরণ সত্বেও মুসলিম যুবকদের ওপর এর দায়-দায়িত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপানো হয়। এটা সবারই ধারণার বাইরে ছিল যে হিন্দুত্ববাদী গ্রুপগলো এমন অমানবিক কাজের পেছনে থাকতে পারে।

কিন্তু, অসীমানন্দ তার স্বীকারোক্তির উপসংহারে যেমনটি বলেছিল, "২০০৮ সনের অক্টোবরের কোন এক সময় ডাঙে আমাকে ফোন করে বলেছিল সে সার্বিদামে এসে আমরা সাথে কিছুদিন থাকতে চায়। আমি তাকে বলেছিলাম যে, যেহেতু আমি গুজরাটের নাদিয়াদে যাচ্ছি, তাই আমার অনুপস্থিতিতে তার সেখানে অবস্থান করা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হবে না। দাঙে আমাকে অনুরোধ করে যে, নাদিয়াদে যাবার পথে আমি যেন তাকে ভায়ারা (Vyara) নামক একটি জায়গা থেকে তুলে নিয়ে বারোদায় নামিয়ে দেই। আমি ডাঙেকে ভায়ারা বাস স্টেশন থেকে আমার গাড়িতে তুলে নেই। তার সাথে রামজি কালচানগ্রা ছিল। উভয়ে ভারী বস্তুতে ভর্তি দুই থেকে তিনটি ব্যাগ বহন করছিল। তারা আমাকে জানায় যে, সে মহারাষ্ট্র থেকে আসছিল। আমি তাদেরকে বরোদার রাজপিপলা জংশনে নামিয়ে দিলাম। আমি পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটা মালেগাঁও বিস্ফোরণের পরের দিনের ঘটনা।" তার স্বীকারোক্তি কারকারি'র প্রদত্ত আলামত দ্বারা আরো দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়।

পরবর্তীতে মহারাষ্ট্র এটিএস ২০০৮ সনের মালেগাঁও বোমা হামলার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ডাঙেকে গ্রেফতার করলে অসীমানন্দ আত্মগোপনে চলে যায়। অবশেষে ২০১০ সনের ১৯ নভেম্বর সিবিআই তাকে হরিদ্বার হতে গ্রেফতার করে।

অসীমানন্দের স্বীকোরুক্তি আর এসএস'এর জন্য বেশ কতোগুলো অস্বস্তিকর প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। এটা কেবল একটা ঘটনা নয় যে, তা সমগ্র সংগঠনকে (আরএসএস) কালিমালিপ্ত করেছে। কিন্তু এমন কিছু জরুরি প্রশ্ন রয়েছে, যা আরএসএস'কে নিজের ভেতরেই মোকাবেলা করতে হবে। আর জাতির কাছে এর জবাব দিতে হবে।

www.pathagar.com

এ সব সন্ত্রাসী হামলার অনেকগুলোতেই উচ্চমার্গের অত্যাধুনিক পরিকল্পনা এবং আরডিএক্স'এর মতো ডিভাইস ও বোমার জটিল কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। বোমা হামলার জন্য অভিযুক্তদের অধিকাংশই অতি সাধারণ পরিবেশ থেকে এসেছে। কোন উঁচু মহলের মুরুব্বীদের সমর্থন অনুমোদন ছাড়াই তারা এমন দুঃসাহসিক দুষ্কর্ম কিভাবে ঘটাতে পারে? কট্টর হিন্দু পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল ধরনের সংগঠনে উর্ধ্বতন মুরুব্বীদের অজান্তে এসব করা আদৌ কি সম্ভব? সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত-আলামত ও আরএসএস'এর বহুসংখ্যক প্রচারক এবং অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের বোমা হামলার সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারে আরএসএস নেতৃত্বের কি জবাব রয়েছে? যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে যে, তাদের কিছুসংখ্যক সদস্য বিগড়ে গেছে, তবে তারা কি তাদেরকে চরম শাস্তি প্রদান করবেন? হিন্দুত্ববাদীদের বিশ্বদর্শন হয়তো রাজনৈতিকভাবেই সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিরোধী। কিন্তু এর কতিপয় সদস্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে মুসলিম ও হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাস চালিয়ে ভারতকে কি পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না? তাদেরকে কি ভেতর থেকে ঝেড়ে ফেলা হবে না?*

www.pathagar.com

স্বপ্রণোদিত মৌলবাদী

একজন সন্দেহভাজন খুনী ও ধর্মান্ধকে সহজেই পূর্বাহ্নেই প্রতিহত করা যেত

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী চক্রান্তের মধ্যমনি সুনীল যোশী (৪৫) রহস্যজনকভাবে তার দেওয়াসের বাড়ীর বাইরে ২০০৭ সনে খুন হয়। এ সময়ের মধ্যেই সে চরম হিংসাত্মক নজির স্থাপন করেছে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, মধ্যপ্রদেশ পুলিশ সময়মতো পদক্ষেপ নিলে এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে সুনীল ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের অনেক দুষ্কর্মই প্রতিহত করতে সক্ষম হতো।

অতীব দরিদ্র পরিবারে যোশীর জন্ম। সে আর এস এস পরিচালিত সরস্বতী শিশু মন্দিরে লেখাপড়া করে। ১৯৯৯ সনে সে আর এস এস'এর মোও (Mhow) জেলা প্রচারক হয়। এখানে সে কট্টর হিন্দুত্ববাদী ধর্মান্ধ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। আর এস এস পরিবারে তাকে গুরুজী নামে ডাকা হতো।

২০০০ সনে যোশী এবং অন্য দু'জন আর এস এস সক্রিয় কর্মী — সন্দীপ দাঙে ও রামচন্দ্র কালচাঙা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যায়। দাঙে ছিল আর এস এস'এর শাহজাপুর জেলা প্রচারক। আর কালাগাঙা ছিল ইন্দোরের। তাদের এ সংঘবদ্ধতা পরবর্তীতে ভয়ঙ্কর ও মরণাত্মক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

স্বামী অসীমানন্দের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে ২০০৬ সন থেকে যোশীকে বোমা হামলার মধ্যমনি হিসেবে উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে অনেক আগ থেকেই সে সন্ত্রাসের সাথে তার সম্পৃক্ত। চরম অমানবিক দুরভিসন্ধিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে ডাঙে ও যোশী মোও'তে স্থানীয় মুসলিমদের ওপর দোষ চাপিয়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা লাগানো'র উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্দিরে হামলা চালানোর জন্য অনেকবার ভয়ঙ্কর চেষ্টা চালিয়েছিল।

২০১০ সনের সেপ্টেম্বরে সি বি আই সন্ত্রাসী হিসেবে মোও থেকে আর এস এস'এর একজন সক্রিয় কর্মী রাজেশ মিশ্রকে খুঁজে বের করলে এ সব চক্রান্তর কথা ফাঁস হয়ে যায়। সে ছিল যোশীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সন্ত্রাসী হিসেবে প্রকাশ হবার প্রাথমিক পর্যায়ে সে নির্বোধের মতোই অসতর্কভাবে যোশীকে বোমা তৈরীর প্রয়োজনী উপাদান সরবরাহ করেছিল। মোও'এর পাশেই পিথামপুরায়

www.pathagar.com

মিশ্র একটি ঢালাই (ফ্রাউন্ডী) কারখানা চালাত। যোশী বাহ্যতঃ আর এস এস'এর বিশেষ জরুরী কাজের জন্য মিশ্রকে এমন ১৫টি customised পাইপ তৈরী করার জন্য অনুরোধ করে, যাদের ভিতরে খাঁজ এবং মাঝখানে ছিদ্র থাকবে। ২০১০ সনের এপ্রিলে যোশী ও দাঙে মোও'এর কাদি (Kade) হনুমান মন্দির ও সরাগ (Kade) মন্দিরে কম ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে একজন সামান্য আহত হয়। কেউই মারা যায় নি। ২০০২ সনের ডিসেম্বর ভূপাল রেল স্টেশনের পাশে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের ধর্মীয় সমাবেশ ইজতেমা থেকে আধা ডজনেরও বেশী পাইপ-বোমা উদ্ধার করা হয়। টেলিভিশন পর্দায় এ সব পাইপ-বোমার ছবি দেখে মিশ্র উদ্বিগ্ন হয়, কারণ সেগুলো দেখতে ছিল ঠিক যোশীকে সরবরাহ করা তার পাইপগুলোর মতোই। মিশ্র উদ্বিগ্ন হয়ে যোশীকে ফোন করলে সে মিশ্রকে উদ্বিগ্ন না হবার পরামর্শ দেয়।

২০০৩ সনের আগস্ট মাসে প্রেয়ারী সিংহ নিনাম নামক জনৈক আদিবাসী নেতার সাথে ঝগড়া-বিবাদের পর যোশী ও দাঙে নিনাম ও তার ছেলে দিনেশকে হত্যা করে। নিনামের পরিবার এফ আই আর'এ যোশী, রাজেশ মিশ্র ও অন্য সাতজনের নাম সন্দেহভাজন হত্যাকারী হিসেবে উল্লেখ করে। এ মামলায় মিশ্রকে গ্রেফতার করা হয়। প্রমাণ থাকা সত্বেও পুলিশ যোশীকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য এ ঘটনায় আর এস এস যোশীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বহিষ্কার করেছে।

গ্রেফতার হবার পর সে পুলিশকে জানায় যে, দু'টি হিন্দু মন্দিরে এবং মুসলমানদের ধর্মীয় সমাবেশে বোমা হামলা চালানোর প্রচেষ্টার পেছনে যোশীই জড়িত ছিল। পুলিশ মন্দিরে বোমা হামলার জন্য মিশ্রকে গ্রেফতার করে। কিন্তু মামলায় যোশীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এভাবে পুলিশ যোশীকে পরবর্তীকালে বোমা হামলা চালাতে সুযোগ করে দেয়, যে হামলায় ডজন খানেক পুরুষ-মহিলা ও শিশু নিহত হন।

২০১০ সনের ফেব্রুয়ারী সি বি আই টিম দেয়াস (Dewas) থানায় গিয়ে একটি ডাইরী এবং হাতের লেখা নক্শা (ড্রয়িং) হস্তগত করে, যা স্থানীয় পুলিশ

www.pathagar.com

যোশী খুন হবার পর তার পকেটে পেয়েছিল। সি বি আই টিম জানতে পারে যে, যোশী খুন হবার পরই তার মোবাইল ফোন, বন্দুক ও ব্যক্তিগত ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী যোশীর ঘর থেকে আর এস এস' কর্মীরা নিয়ে যায়। স্থানীয় পুলিশ সি বি আই'কে আরো জানায় যে, যোশীর খুন হবার ব্যাপারটি তীক্ষ্ণভাবে তদন্ত না চালাতে তারা বিভিন্ন মহল থেকে ভীষণ চাপের মুখে ছিল।

সি বি আই যোশী'র ফোনবুকে আর এস এস'এর দু'জন উর্ধ্বতন নেতার নাম পায়। এদের একজন ইনদ্রেস (Indresh) কুমার এবং অন্যজন — আর এস এস'এর মুখপাত্র রাম মাধব। ইনদ্রেস'এর ফোন নম্বরকে 'জরুরী' নম্বর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামী অসীমানন্দের নামের সাথেও একই শব্দ লেখা রয়েছে। এছাড়া এই ডাইরীতে আর এস এস'এর নতুন দিল্লীস্থ সদর দফতরের এবং লোক সভায় বিজেপি'র বিভেদ সৃষ্টিকারী সদস্য হিসেবে পরিচিত যোগী অদ্বিত্বনাথ (Yogi Adityanath)'র নাম ফোন নম্বর ছিল ।

হস্তাঙ্কিত নক্শা একটি সার্কিট বোমার বলে প্রতীয়মান হয়। ঐ নকশা'র পাশে দিল্লীর একটি ঠিকানা রয়েছে, যেখানে ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক সার্কিট প্রস্তুত করা হয় বলে মনে করা হলেও যোশীর অঙ্কিত নক্শার মাধ্যমে তা' চিহ্নিত করা যায়নি। যোশী আনুষ্ঠানিকভাবে আর এস এস হতে বহিস্কৃত হওয়া সত্বেও ২০০৭ সনের জুন ও ডিসেম্বর'এর মধ্যবর্তী সময়ের ফোন কল রেকর্ড এর এস এস'এর সাথে তার সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময়ের মধ্যে যোশী যেসব ফোন করেছে এবং পেয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, তার বহিস্কারের পরেও সে আর এস এস'এর বিভিন্ন উর্ধ্বতন ও বয়োজেষ্ঠ্য নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখতো।

এ সব প্রমাণ করে যোশী তার চিতার (মৃত্যু) সাথে অনেক প্রশ্নের জবাব নিয়ে গেছে। কিন্তু সে তার পেছনে অস্পষ্ট আলামত ও প্রামাণ্য বস্তুর মাধ্যমে বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন রেখে গেছে।

www.pathagar.com

অস্বচ্ছ গ্রেফতার

তেহেলকা:ভলিউম ৮, সংখ্যা ২, জানুয়ারী ১৫, ১০১১ ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা পূর্ব-ধারণাপ্রসূত (prejudice) বিপদজনক পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত। কোথাও কোন বোমা বিস্ফোরিত হলে ধরে নেয়া হয়, এর পেছনে কোন মুসলিম জড়িত। এমন অমূলক ধারণার কারণে সুষ্ঠু বিচার মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এভাবে হিন্দুত্ববাদীদের ঘটানো বোমা হামলার ঘটনায় অকারণে মূল্য দিতে হয়েছে ৩২ জন মুসলমানদেরকে। উগ্রপন্থী হিন্দুরা সন্ত্রাসী হামলা এমনকি মুসমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানোর পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। একাজে ভারতীয় মিডিয়া, পুলিশ প্রশাসন এমনকি বিচার বিভাগ, কোন নিরপেক্ষ তদন্ত না চালিয়ে তাদের অমূলক ধারণায় বিভ্রান্ত হয়ে মুসলমানদেরকে অনাহুত শাস্তি দিয়ে চলেছেন। ভারতীয় সাময়িকী তেহেলকা ১৫ জানুয়ারী 'এন এ্যাংগ্রী হাল অব ফল্ গাইজ এন্ড আনফ্রেয়ার এ্যারেস্টস' শীর্ষক নিবন্ধে এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগের কিছু ঘটনা তুলে ধরেছে। আমরা এর কিছুটা তুলে ধরছি:

ভাগ্যচক্রে কারাবন্দী জনৈক মুসলিম যুবক ও কট্টরপন্থী হিন্দুর মধ্যে কারাগারে অভাবিত সাক্ষাতের সূত্র ধরে গড়ে ওঠা আন্তরিকতা এক পর্যায়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী তৎপরতার গোপন রহস্য উন্মোচন করে।

২০০৭ সনে হায়দারাবাদ পুলিশ মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে আবুল কালাম (১৮) নামক এক মুসলিম যুবককে তার বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে যায়। ঐ বোমা হামলায় নয়জন মুসলিম মুসুল্লি নিহত হন। কালাম বোমা হামলার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই বলে বার বার দাবী করলেও তার কথায় কোন ফলোদয় হয়নি। কালাম একজন মুসলিম — এ পরিচিতিই ছিল তার অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবার জন্য যথেষ্ঠ। অন্যদিকে তার ছোট ভাই আবদুল খাজা ক'বছর আগে পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় গোয়েন্দা সংস্থার ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হয়েছিল যে, খাজা পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার জন্য কাজ করছে। খাজা পুলিশের খাতায় পলাতক আসামী হিসেবে চিহ্নিত।

www.pathagar.com

কালাম ঐ সময় সেলফোন ও সিমকার্ড বিক্রির ব্যবসা চালাচ্ছিল। একই সাথে সে মেডিক্যাল ল্যাবরোটরীর টেকনেশিয়ান কোর্সে অধ্যয়ন করছিল। মক্কা মসজিদে দুটি বোমা রাখা হয়। প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হয়, ঘটনাক্রমে দ্বিতীয়টি বিস্ফোরিত হয় নি। যেহেতু অবিস্ফোরিত বোমার সাথে একটি মোবাইল ফোনসেট ও সিমকার্ড পাওয়া গেছে, পুলিশ অমূলকভাবে নিশ্চিত হয় যে, বোমা বিস্ফোরণের পেছনে কালামের হাত ছিল (কারণ কালাম সেলফোন ও সিমকার্ড বিক্রেতা)। এ বিশ্বাস কতোখানি যথার্থ, তা কোন ব্যাপার নয় — আলামত পাওয়া গেছে, এটা'ই যথেষ্ট। কয়েক ডজন মুসলিম যুবকের সাথে কালামের ওপরও চরম নির্যাতন চালানো হলো এবং মুক্তির আগে ১৮ মাস কারাগারে আটক রাখা হলো।

এদিকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' কালামের ভাই খাজাকে শ্রীলংকা হতে গ্রেফতার করে এবং হায়দারাবাদ কারাগারে প্রেরণ করে। ইতোমধ্যে ২০১০ সনে খাজাকে একটি সেলফোন সেট দেয়ার জন্য কালামকে অভিযুক্ত করে পুলিশ তাকে পুনরায় গ্রেফতার করে।

এ সময়েই কারাগারে কারাগারে স্বামী (হিন্দু ধর্মোপদেষ্টা) অসীমানন্দ কালামের সাক্ষাত পায়। নিরাপরাধী যুবক কালাম স্বামীর প্রতি অতীব সহানুভূতিশীল আচরণ করে এবং তাদের মধ্যে প্রায়ই কথাবার্তা হতো। অসীমানন্দ দেখল কালামকে এমন এক অপরাধে জেল দেয়া হয়েছে এবং শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, যা' কালাম নয়, বরং সে (অসীমানন্দ) এবং অনুসারী বা সঙ্গীরাই ঘটিয়েছে। বিষয়টি অসীমানন্দের মনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্র করার মানসে অসীমানন্দ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অপরাধ সংঘটনের স্বীকোরুক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বামীর স্বীকোরুক্তি এ বিষয়টিকে খোলাসা করে যে, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অহেতুক পূর্ব-ধারণাপ্রসূত ব্যাধিতে আক্রান্ত।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের বোমা বিস্ফোরণের জন্য যে ৩২ জন নিরাপরাধ মুসলিম যুবককে চরম মূল্য দিতে হয়, তাদের ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেয়া হলোঃ

www.pathagar.com

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের বোমা বিস্ফোরণের খেসারত দিচ্ছেন ৩২ জন নিরাপরাধ মুসলিম যুবক

আসিফ খান: ভারতীয় মুসলিম ছাত্র আন্দোলন 'সিমি' (SIMI)র সদস্য। ১৪ নভেম্বর ২০০৬ সনে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তেহেলকা প্রতিবেদন প্রকাশ করার সময় তিনি আর্থার রোড জেলে আটক ছিলেন

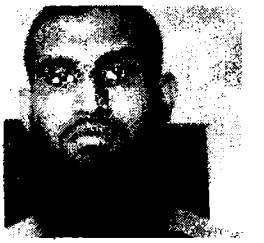

আবদুল ছাত্তার: হুজি (হরকাতুল জিহাদ)'এর ভূয়া সদস্য। পুলিশের চর। মক্কা মসজিদ ঘটনায় তার নিজের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়।

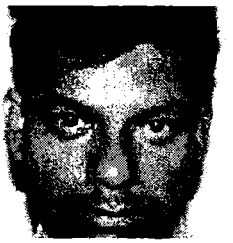

আবদুল ওয়াসি: জনৈক হিন্দ-চালিত একটি হোটেলের একটি কক্ষে তৈরী বোমা পেতে রাখার অভিযোগ আনা হয়।

আবরার আহমেদ: সিমি'র সদস্য। আর্থার রোড জেলে আটক ছিলেন। তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সেলিম ফার্সী: সিমি সদস্য হিসেবে চিহ্নিত। ২০০৬ সনের ৬ নভেম্বর গ্রেফতার হবার পর আর্থার রোর্ড জেলে ছিলেন।

আরশাদ খান: তিনিও শহীদ বেলারের এলাকার অধিবাসী। তার সাথে কোন সন্ত্রাসী দলের সম্পর্ক নেই।

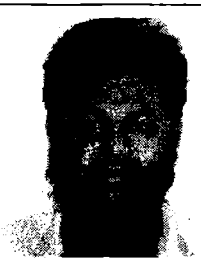

ফারুক আনোয়ার : সিমি'র সদস্য। ৬ নভেম্বর ২০০৬ সনে গ্রেফতার হয়ে আর্থার রোর্ড জেলে ছিলেন।

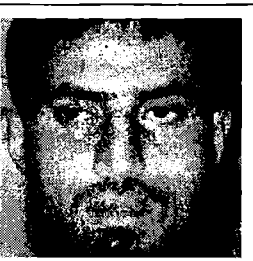

গোলাম ছিদ্দিক: হায়দারাবাদে একটি মন্দিরে হামলার চক্রান্তের অভিযোগে বিচারাধীন রয়েছেন।

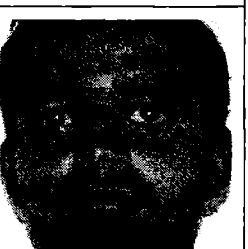

ইব্রাহীম জুনায়েদ: বিজেপি এমএলএ ইন্দ্রাসেন রেড্ডিকে হত্যার চক্রান্তের অভিযোগ আনা হলেও শেষ পর্যন্ত নির্দোষ প্রমাণিত হন।

www.pathagar.com

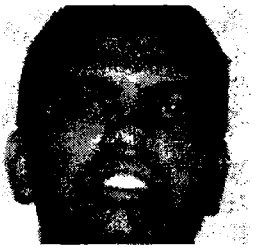	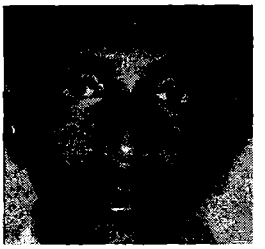	
মাকসুদ আহমেদঃ যুবকদের সংগ্রহ করে সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তানে প্রেরণের অভিযোগ রয়েছে।	**মোহাম্মদ আবদুল কাদেরঃ** সাবেক সিমি সদস্য। তার একটি ফোনের দোকান ছিল। কোন অপরাধের রেকর্ড নেই।	**মোহাম্মদ বালেক উদ্দিনঃ** পুলিশের মতে সিমি'র জঙ্গী নেতা সফদার নাগরীর সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে।
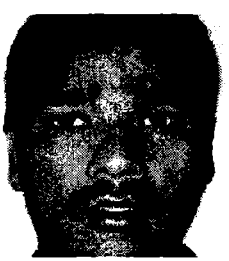	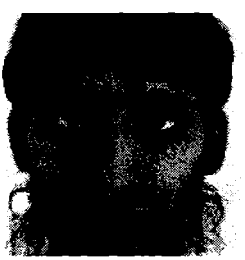	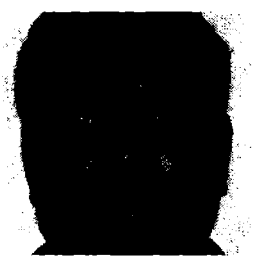
আবদুল মজিদঃ শহীদ বেলালের ভাই। অপরাধের কোন অতীত রেকর্ড নেই।	**আবদুল করিমঃ** সিমির সাবেক সদস্য। অপরাধের কোন অতীত রেকর্ড নেই।	**আবদুল ওয়াজেদঃ** সিমির সাবেক সদস্য। সিমির বৈঠকে যোগদান ছাড়া অপরাধের কোন অতীত রেকর্ড নেই।
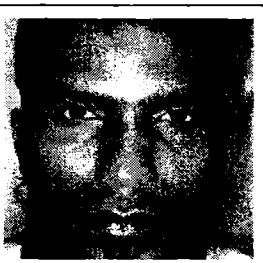	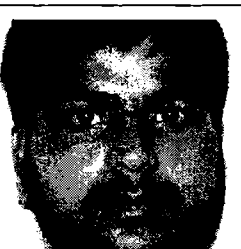	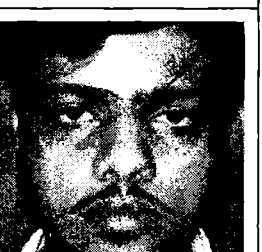
মোহাম্মদ শাকিলঃ হায়দারাবাদে জঙ্গী মুসলিম নেতা মাহবুব আলীর গাড়ী চালক।	এম. **আবদুল রহিমঃ** বিজেপি এমএলএ ইন্দ্রাসেন রেড্ডিকে হত্যার চক্রান্তের অভিযোগ আনা হলেও শেষ পর্যন্ত নির্দোষ প্রমাণিত হন।	এম **ইয়াসিরঃ** সাবেক সিমি সদস্য। তার আব্বাকে জঙ্গী সন্দেহে POTA অধীনে গ্রেফতার করা হয়।

www.pathagar.com

		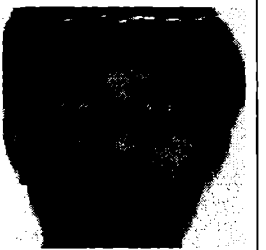
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী: তিনি শহীদ বেলালের বন্ধু। অপরাধের কোন অতীত রেকর্ড নেই।	**মোহাম্মদ নাসফেরুদ্দিন:** সিমির সাথে সম্পর্কের বা অপরাধের কোন অতীত রেকর্ড নেই।	**মোহাম্মদ রায়েসুদ্দিন:** বিজেপি এমএলএ ইন্দ্রাসেন রেড্ডিকে হত্যার চক্রান্তের অভিযোগ আনা হলেও শেষ পর্যন্ত নির্দোষ প্রমাণিত হন।
	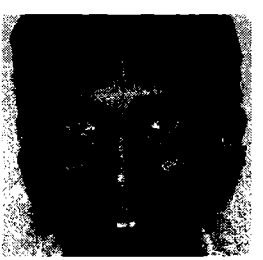	
জাহিদ আবদুল: সিমি'র সদস্য। ২২ নভেম্বর ২০০৬ সনে গ্রেফতার হয়ে আর্থার রোড জেলে রয়েছেন।	**মুস্তাসিন বিল্লাহ:** সিমি'র সাবেক সদস্য। সফদার নাগরীর জঙ্গী গুপের সাথে জড়িত।	**মনোয়ার আহমেদ:** মালেগাঁও অধিবাসী ২৯ বছর বয়সী ছাত্র।
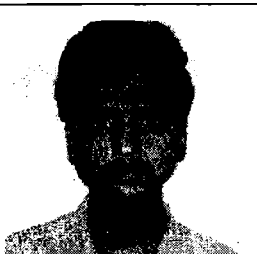	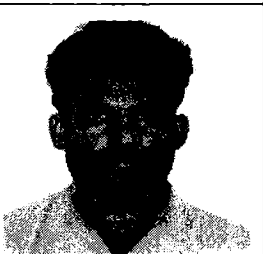	
নুরুল দোহা: সিমি সদস্য। ২০০৬ সনের ৩০ অক্টোবর গ্রেফতার হয়ে আর্থার রোড জেলে রয়েছেন।	**রাফেজ আহমেদ:** ২০০৬ সনের ৫ নভেম্বর গ্রফতার হয়ে আর্থার রোড জেলে রয়েছেন।	**রিয়াজ আহমেদ:** মালেগাঁও'এর অধিবাসী ।

www.pathagar.com

সাব্বির আহমেদ: সিমি সদস্য। ২০০৬ সনের ২ নভেম্বর গ্রফতার হয়ে আর্থার রোড জেলে রয়েছেন।

শায়েখ মোঃ ফারেদ: সাবেক সিমি সদস্য। কোন অপরাধের রেকর্ড নেই।

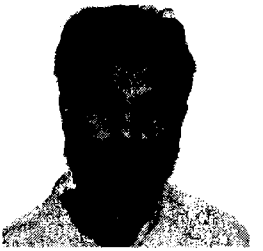

মোহাম্মদ আলী আলম: সিমি সদস্য। ২০০৬ সনের ১৪ নভেম্বর গ্রেফতার হয়ে আর্থার রোড জেলে রয়েছেন

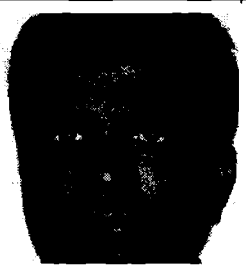

সৈয়দ কাদের: পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গীদলে যোগদানকারী আবদুল খালা'র ভাই।

আবদুল কালেম: মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের সাথে সংশ্লিষ্টতার জন্য গ্রেফতার হয়ে ১৮ মাস যাবত জেলে রয়েছেন।

ছবি ও পরিচিতি তেহেলকা'র সৌজন্যে

ভিত্তিহীন ভূয়া ও পূর্ব-ধারণাপ্রসূত অমূলক ধারণা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিভাবে প্রভাবিত করে অসীমানন্দের অপরাধ স্বীকোরুক্তিমূলক জবানবন্দীতে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

দুঃখবহ হৃদয়বিদারক ভীতি ও সন্ত্রাসের যুগে সবাই ন্যায়সঙ্গতভাবেই অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ শাস্তি প্রত্যাশা করে। এ চ্যালেঞ্জের সড়ক তেমন মসৃণ নয়। রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সব সময়ই এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সফল হয়নি।

গত এক দশক (২০০০-২০১০) ধরে — বিশেষতঃ ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে ভারত প্রায়ই ভয়ার্ত সন্ত্রাসী হামলায় কেঁপে ওঠে। ডজন ডজন

www.pathagar.com

মুসলিম যুবক অসহায়ভাবে অবলোকন করেছে কিভাবে তারা মিথ্যাচারিতার শিকার হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সন্ত্রাসের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। একটি নিরাপদ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সন্ত্রাসের মূল হোতাদের খুঁজে বের করে যথার্থ জবাব পাওয়া অতীব কঠিন। আরো জটিল ন্যায়বিচার ও আইনের শাসনের ধারণার প্রতি অবিচল থাকা, সর্বোপরি অহেতুক দুর্বিষহ মনোযাতনার শিকার না হওয়া। ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে অহেতুক বাজে ধারণা ও সন্দেহের মানসিকতা বিপজ্জনকভাবে গেঁড়ে বসেছে। এর প্রতিফলণ ঘটে ভারতীয় তদন্ত সংস্থাসমূহের তদন্তে। তারা তাৎক্ষণিক অনুমানে অভ্যস্থ — প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনার পেছনেই মুসলমানদের হাত রয়েছে। তারা এমন মৃগী (হিস্টরিয়া) রোগে আটকা পড়েছে যে, এটা কোন ব্যাপারই নয়, তাদের ধারণা সত্যি কিংবা তারা যথার্থ মুসলিম অপরাধীকে গ্রেফতার করলো কি না — এসব তাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। তাদের মূল বিবেচ্য হলো কাউকে না কাউকে তো দায়ী করতেই হবে এবং এ ধরনের দায়ী করার ব্যাপারটি দ্রুততার সাথেই হয়ে থাকে।

মুসলিম যুবকদের গ্রেফতার বিদ্বেষ-প্রসূত মানসিকতা ও অবহেলার প্রতিফলণ বিশেষ। মহারাষ্ট্র এটিএস' প্রধান হেমন্ত কারকার বেরোখা হয়ে তদন্ত চালানোর আগে কেউই জানতো না যে, ২০০৮ সনের মেলেঙ্গা বোমা বিস্ফোরণ ছাড়াও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ও মসজিদে সন্ত্রাসীর হামলার সাথে হিন্দুত্ববাদীরা জড়িত ছিল, যদিও এসব হামলার দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের ওপরই চাপিয়ে দেয়া হয়।

দুঃখজনক ঘটনা হলো, প্রায়ই এ ধরনের সব গ্রেফতার কেবল মুসলিম-বিরোধী হিসেবে পরিচিত বিজেপি-শাসিত রাজ্যসমূহেই হয়নি, কংগ্রেস ও কংগ্রেস-জোট শাসিত অন্ধ্য প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যসমূহেও হয়েছে। স্বামী অসীমানন্দের আপন অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রমাণ করছে যে, মক্কা মসজিদ ও মেলেঙ্গা বোমা হামলার ঘটনায় ৩২ জন মুসলিম যুবকের গ্রেফতার মিথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো চরমপন্থী হতে পারে, কারো কারো হয়তো (অপরাধ সংক্রান্ত) অস্পষ্ট ঘটনাও রয়েছে, কিন্তু তারা

www.pathagar.com

সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িত ছিল না। নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ তাদের প্রতি যে আচরণ করেছে, তা ছিল বিব্রতকর ও অমানবিক, ব্যর্থ ও বাজে তদন্তের প্রতিফলন।

তৎকালীন সিবিআই'এর যুগ্ম পরিচালক অরুন কুমার মক্কা মসজিদের বোমা হামলার মামলাটি তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন। ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৭ হায়দারাবাদের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন) হরিষ গুপ্ত'এর পাঠানো একটি চিঠি পেয়ে তিনি হতভম্ব হন। গুপ্তের দুই পাতার এ চিঠির সাথে স্বীকারোক্তির এবং নারকো-বিশ্লেষণের সিডিও পাঠানো হয়। ২৫ জন আসামীর তালিকা দিয়ে এতে দাবী করা হয়, মক্কা মসজিদ মামলার সুরাহা করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ২৫ জনের মধ্যে ১৯ জনই মুসলিম যুবক ছিল হাযদারাবাদের অধিবাসী। আর বাকী ছয় জন বাংলাদেশী। গুপ্ত জানালেন, স্থানীয় ১৯ জনের মধ্যে ১১ জনকেই ইতোমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গুপ্ত আরো দাবী করেন যে, আসামীদের দুই জন মক্কা মসজিদে বোমা হামলায় তাদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। [এ মিথ্যেও মিডিয়া এবং পুলিশের তথাকথিত মিথ্যাচারের প্রমাণ। আমাদের দেশেও প্রায়ই আমরা পুলিশের এমন মিথ্যাচার শুনি যে, অমুক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি রিমান্ডে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে এবং অমুক অমুকের নাম বলেছে। সরকার ভিন্নমতাবলম্বীদের ধরার জন্য পুলিশকে দিয়ে এমন মিথ্যে কথা মিডিয়ায় প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে — এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। অনুবাদক]।

যে কেউ বিস্মিত হবেন যে, সিবিআই ৯ জুন (২০০৯) তদন্তের দায়িত্ব নেয়া সত্বেও হায়দারাবাদ পুলিশ কেন মক্কা মসজিদ মামলার তদন্তের উদ্যোগ নেয়। বাস্তবতা হলো, মক্কা মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে দুটো পৃথক মামলা দায়ের করা হয়। বিস্ফোরিত বোমার জন্য একটি এবং অবিস্ফোরিত বোমার জন্য অপর মামলা করা হয়। কারণ অবিস্ফোরিত বোমাটিই ছিল সন্ত্রাসী হামলার অনুকূলে একমাত্র আলামত।

বিস্ফোরিত বোমার মামলাটি সিবিআই'এর কাছে পাঠানো হলেও অন্ধ্র প্রদেশ

www.pathagar.com

সরকার অবিস্ফোরিত বোমার মামলাটি স্থানীয় পুলিশের হাতে রেখে দেয়। শেষোক্ত মামলার নম্বর ১০৭/২০০৭। এটা হুসাইন আলম থানায় দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে মামলাটি সেন্টাল ক্রাইম স্টেশনে প্রেরণ করা হয়। এ মামলাটির তদন্ত গুপ্তের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল।

অবিস্ফোরিত বোমাটির সাথে থাকা অক্ষত নকিয়া মোবাইল সেট ও সিমকার্ডটিই ছিল বোমা হামলার একমাত্র উপাদান ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, যা' চূড়ান্ত পরিণতিতে সিবিআই ও রাজস্থান এটিএস'কে আরএসএস প্রচারকদের পাকড়াও করার দিকে ধাবিত করলেও তদন্তের দায়িত্ব শুরুতেই এর দায়িত্ব সিবিআই'কে দেয়া হয়নি। হায়দারাবাদ পুলিশ আসামীদের ধরতে তৎপর হয়। তবে এক্ষেত্রে তারা আসল অপরাধীদের চিহ্নিত করার প্রয়াস না চালিয়ে, এর বিপরীতে, তাদের চিরাচরিত সন্দেহভাজন আহলে হাদিস অনুসারীদের হন্যে হয়ে খোঁজে।

এসব মুসলিম যুবকদের একজন হলো আহলে হাদিস সদস্য আবদুল ছাত্তার (২৪)। কিছুদিনের জন্য সে পুলিশের তথ্য-সংগ্রাহক (সোর্স) হিসেবে কাজ করেছে। তাকে লস্কর-ই-তাইয়েবা'র সাথে ঘনিষ্ঠ হিসেবে দেখিয়ে পাকিস্তানে জঙ্গী প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য দায়ী করা হয়। (সে যে একজন পাকা জঙ্গী, বাইরে তা' বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যই এ মিথ্যেচার — অনুবাদক)। মক্কা মসজিদে বোমা হামলার সময়ও সে পুলিশের তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে নিয়োজিত ছিল। ছাত্তার পুলিশকে সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের একটি তালিকা সরবরাহ করে। পরবর্তী সপ্তাহসমূহে পুলিশ ৩৬ জন মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করে তাদের ওপর নির্যাতন চালায়।

আবদুল কালেম ছিলেন গ্রেফতারকৃতদের অন্যতম। ঠিক এ সময়ে সিবিআই অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের কাছে অবিস্ফোরিত বোমার মামলাটি সংস্থাটির কাছে বদলি করার আরজি জানায়। হায়দারাবাদ পুলিশ জানত, আজ হোক আর কাল হোক মামলাটি এক সময় সিবিআই'কেই দেয়া হবে। তাই তারা এ সন্ত্রাসী চক্রান্তকে জড়িয়ে তিনটি পৃথক নতুন মামলা রুজু করে।

১. গোপালপুরাম থানায় নথিভূক্ত ১৯৮/২০০৭ নং মামলায়

www.pathagar.com

সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে ভারতে জেহাদী আন্দোলনকে সমর্থন দেয়া ও ভারতে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালানোর জন্য মুসলিম যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ করার চক্রান্তের অভিযোগ আনা হয়।

২. বিশেষ তদন্ত টিমের কাছে রুজু করা ১০০/২০০৭ নং মামলায় হায়দারাবাদে ও ভারতের অন্যত্র বোমা হামলা চালিয়ে ধবংসাত্মক কাজ চালিয়ে হায়দারাবাদে ও ভারতের অন্যত্র সাম্প্রদায়িক গোলযোগ সৃষ্টির চক্রান্তের অভিযোগ আনা হয়।

৩. বিশেষ তদন্ত টিমে রুজু করা ৭৫/২০০৭ নং মামলায় ভূয়া নাম ব্যবহার করে কালেমসহ তিন ডজনের বেশী মুসলিম যুবককে মোবাইল ফোন সংযোগ দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে যোগাযোগের সুবিধা করে দেয়ার অভিযোগ আনা হয়। পুলিশের চর সাত্তারের নামও এদের সাথে জুড়ে দেয় হয়, কেননা তার ভয় ছিল সে কারাগারের বাইরে থাকলে সে স্থানীয় মুসলিম যুবকদের টার্গেটে পরিণত হতে পারে। তার জন্য কারাগারই ছিল সব চেয়ে নিরাপদ জায়গা।

এ তিনটি মামলার ভিত্তিতে পুলিশ কালেমসহ অনেক যুবককেই নার্কো-বিশ্লেষণ (এনালাইসিস) টেস্টের জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশ তাদের কাছ থেকে এমন কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারে নি, যা' ব্যবহার করে তাদের কাউকে মক্কা মসজিদে হামলার সাথে সম্পৃক্ত বলে চিহ্নিত করা যায়। এতদসত্বেও পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয় নি। তাদের হাতে একমাত্র প্রমাণ ছিল নির্মম নির্যাতনের মুখে আদায়কৃত স্বীকারোক্তি। নির্যাতনের মুখে আদায় করা এ তথাকথিত স্বীকারোক্তিই ছিল এ মামলার একমাত্র (ভূয়া — অনুবাদক) প্রমাণ। এতদসত্বেও পুলিশ চেয়েছিল সিবিআই এর ভিত্তিতেই বন্দীদর গ্রেফতার করুক।

২০০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে একটি অনুরোধে সাড়া দিয়ে সিবিআই হায়দারাবাদে যাবার পর তারা জানতে পারেন যে, আসামীদের জবানবন্দী

www.pathagar.com

পুরোপুরি ভূয়া। হায়দারাবাদ জেলে সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই এমন ধারণায় উপনীত হয় যে, গ্রেফতারকৃতদের কেউ কেউ উগ্রবাদী হলেও তারা মক্কা মসজিদ বোমা বিস্ফোরণের সাথে জড়িত ছিল না। স্থানীয় পুলিশের পীড়াপীড়ি প্রতিহত করে সিবিআই মুসলিম যুবকদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (চার্জসীট) গঠন করতে অস্বীকার করে।

পরবর্তীকালে হায়দারাবাদ পুলিশের রুজুকৃত তিনটি মামলা থেকেই মুসলিম যুবকদের অব্যাহতি দেয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। মামলার পেছনে কোন শক্ত প্রমাণ না থাকায় পুলিশ এ সব মামলা নিয়ে মুসলিম যুবকদের মুক্তির বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপিল করে নি। ফলে ২০০৮ সনের জানুয়ারী মাসে অন্ধ্র প্রদেশ সরকার চূড়ান্ত পর্যায়ে অবিস্ফোরিত বোমার মামলাটি সিবিআই'এর কাছে হস্তান্তর করে।

মুসলিম যুবকরা এ মামলায় নির্দোষ হিসেবে খালাস হতেও পারে। তবে বাস্তবতা হলো এ ধরনের গ্রেফতার অতি সাধারণ ও নিরীহ এবং নিরাপরাধ নাগরিককে সমাজে নিন্দনীয় অবস্থার নিয়ে যায়। তার মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয় ছাড়াও তাদের পক্ষে একটি চাকরি, এমনকি বাসা ভাড়া করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এ পরিস্থিতি দু'টো প্রশ্ন সামনে এনেছে: পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য বাস্তব অভিযোগ না থাকা সত্বেও কেন তাদের প্রতি অন্যায় অভিযোগ আরোপ করে? আর এ সব যুবকদের যে ক্ষতি হয়েছে তা' কে নিরাময় করবে বা এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে ?

২০০ সনের ৮ সেপ্টেম্বর সাম্প্রাদিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্পর্শকাতর মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও'তে চারটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ৩৭ জন মুসলমান নিহত ও শত শত আহত হন। তিনটি বোমা মেলেগাঁও'এর বৃহত্তম হামিদিয়া মসজিদে এবং চতুর্থ বোমাটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মুশারওয়াট চক্ বাজারে পাতা হয়। ঐ দিন ছিল শুক্রবার এবং ঐ বছর ঐ দিনটিতে মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শবে বরাত ছিল। স্পষ্টভাবে বোমা হামলাকারীরা ঐ বিশেষ দিবসে মুসলমানদেরকে টার্গেট করেছিল।

২০০৫ সনের অক্টোবর থেকেই ভারতের মূল ভূখন্ডে ব্যাপক বোমা হামলা

www.pathagar.com

নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দিল্লীতে দেয়ালীতে বিস্ফোরণের মাধ্যমে এ হামলা শুরু হয়। এর পরই বারানশি ও বোম্বাইতে রেলগাড়ীতে বোমা বিস্ফোরিত হয়। প্রথম দিকের ঘটনাগুলোতে হিন্দু এবং তাদের মন্দিরকে লক্ষ্য করেই বোমা হামলা চালানো হয়। মালেগাঁও'তে হামলা চলে মুসলমান ও তাদের মসজিদের ওপর। মহারাষ্ট্রের মুসলমানদের কেন্দ্রীয় মসজিদের কাছে বোমা বিস্ফোরণের আগেই ২০০৩ সনের নভেম্বরে পারবহানির মোহাম্মদীয়া মসজিদে, ২০০৪ সনের আগস্ট মাসে জালনার কাদেরীয়া মসজিদে এবং একই বছরের একই মাসে পারবহানি জেলার পুনার মেরাজুল উলুম মসজিদে বোমা বিস্ফোরিত হয়।

নানদেদে একটি ঘরে বোমা প্রস্তুতের সময় আরএসএস'এর সদস্য ও বজরংদলের জনৈক কর্মী নিহত হলে উপরোক্ত মামলাসমূহের সুরাহা করা সহজতর হয়। কিন্তু চক্রান্তের মূল উৎসে না গিয়ে মহারাষ্ট্র এটিএস বজরং দলের নিচুস্তরের কিছু কর্মীকে গ্রেফতার করে এবং নানদেদ, জালনা ও পারবহানি বোমা বিস্ফোরণের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (চার্জশীট) গঠন করে। কিন্তু এ মামলা অচিরেই লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়।

২০০৬ সংঘঠিত মেলাগাঁও বোমা হামলা মামলাটি মহারাষ্ট্র এটিএস পুনরায় তদন্তের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এটিএস (ATS) অপরাধ তদন্তের প্রাথমিক ও মৌলিক সূত্রটিই উপেক্ষা করেছে: তুমি যদি অপরাধীকে ধরতে চাও, তবে প্রথমেই এর উদ্দেশ্য খোঁজ কর।

মহারাষ্ট্র এটিএস তেমন উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হয়নি। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল নড়বড়ে এবং দ্বিধান্বিত। এর সাথে সংশ্লিষ্টদের মতে মালেগাঁও'এর স্থানীয় কিছু মুসলমান, প্রধানতঃ নিষিদ্ধ সিমি (SIMI)'র সদস্যরা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধানোর উদ্দেশ্যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কিছু মুসলিমকে হত্যা করে। মালেগাঁও হতে নয়জন মুসলিমকে গ্রেফতার করা হয়। অন্য তিনজনকে পলাতক দেখানো হয়। কেউই এটিএস'এর তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্বাস করেনি। মুসলমানদের পক্ষ থেকে যথার্থ তদন্তের দাবী জোরদার হতে থাকলে কংগ্রেস-জোট সরকার তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই'এর কাছে হস্তান্তর করে।

www.pathagar.com

কিন্তু মহারাষ্ট্র সরকার কর্তৃক তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই'কে দেয়ার চিঠি লেখার দিনই মহারাষ্ট্র এটিএস তাদের চার্জশীট জমা দিলে ন্যায্য তদন্তের সম্ভবনা ও সুযোগ মাটি হয়ে যায়। ২০০৬ সনের সেপ্টেম্বর থেকেই নয়জন মুসলিম কারাগারে দুঃসহ জীবন কাটিয়েছেন।

সন্ত্রাসী হামলার তদন্তে পুলিশের প্রশ্নবিদ্ধ প্রায় অপরাধতূল্য ভূমিকা ফাঁস করে অসীমানন্দ দিল্লী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দীপক দেবাসকে বলেছে যে, সুনীল জোসী'র নেতৃত্বে কয়েকজন আর এস এস প্রচারকর্মী ২০০৬ সনে মালেগাঁও বোমা হামলা ঘটায়। অসীমানন্দ জোরালোভাবে স্বীকার করেছে যে, ব্যাপক মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় সে নিজেই মালেগাঁওকে একটা টার্গেট হিসেবে বেছে নেয়। সিবিআই সুনীল যোশীর ফোনবুকে সরদার নামে একজনের নম্বর পেয়েছে। এ ব্যাপারে আরো তদন্ত চালিয়ে সিবিআই এ সত্য উদ্ধারে সক্ষম হয়েছে যে, এ নম্বরটি আসলে আর এস এস কর্মী হিমাংশু পাঞ্চীর যে বোমা প্রস্তুত করার সময় মারা যায় এবং এ হিমাংশুই ছিল জালনা ও পারবানি বোমা বিস্ফোরণ চক্রান্তের মূল হোতা।

আর এস এস'এর আরেক কর্মী এবং যোশী ও দাঙের সহযোগী দিওয়াস অঞ্চলের শিভাম ঢাকাদকে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ ক'মাস আগে একটি হত্যা মামলায় গ্রেফতার করে। সে বাহ্যতঃ সি বি আই'কে বলেছে যে, পাঞ্চের মৃত্যুর খবর শুনে জোসী শিশুর মতো কেঁদেছিল।

অসীমানন্দের স্বীকোরুক্তি কিছু স্পষ্ট প্রশ্ন ভারত সরকারের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছেঃ তদন্তকারী সংস্থাগুলোই যদি যথার্থ অপরাধীদের চিহ্নিত করতে কোন বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে না পারে, তা' হলে সাধারণ ভারতীয়রা কোথায় যাবে? তদন্ত সংস্থাগুলো রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিংবা তাদের উপরওয়ালাদের স্নেহভাজন হবার জন্য কিংবা সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য অথবা ব্যর্থতা ঢাকার জন্য যদি অপরাধীদের পাকড়াও করার নামে নিরাপরাধ নিরীহ মানুষকে পাকড়াও করে অকারণে নির্যাতনের মুখে নিক্ষেপ করে, তবে সাধারণ নাগরিকরা কি সুবিচার হতে বঞ্চিতই থাকবে ?

www.pathagar.com

এটা নিছক অপরাধ স্বীকারোক্তিই নয় ----------

অসীমানন্দের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী বিভিন্ন মহলে তীব্র ও বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার ঝড় তোলে। ২০০৬ সনে মালেগাঁও বোমা হামলায় জন্য ৩১ জন মুসলিম নিহত হবার ঘটনার সাথে জড়িত অন্যায়ভাবে জড়িয়ে দেয়া নয়জন মুসলিম যুবকের পরিবার মনে করে এ স্বীকারোক্তি কথিত আসামীদের অপরাধশূন্যতার প্রমাণপত্র। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি ও আরএসএস'এর অভিযোগ হিন্দুত্ববাদীদের ওপর দোষ চাপিয়ে চলমান তদন্ত প্রক্রিয়াকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই চরম নির্যাতনের মুখে অসীমানন্দকে এমন জবানবন্দী দিতে বাধ্য করা হয়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো — অসীমানন্দ দুই দিন বিচারিক হেফাজতে কাটিয়ে দিলীর ম্যাজিস্ট্রেটের রুদ্ধদ্বার চেম্বারে অন্য কারো উপস্থিতি ব্যতিরেকে গভীর চিন্তা-ভাবনার পর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এ জবানবন্দী প্রদান করে। অন্যদিকে যে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে, তা' হলো অসীমানন্দের স্বীকারোক্তি এতোই যথার্থ যে, ঐ স্বীকারুক্তির পর চার বছর ধরে চলা বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে উদ্ধারকৃত বস্তুগত ও অবস্থাগত আলামত তথা প্রমাণাদিকে তা' কেবল সুনিশ্চিত ও সমৃদ্ধ করেছে।

তিন বছর ধরে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তদন্ত দল আর এস এস'এর প্রচারক ও অভিনব ভারত, জয় বন্দে মাতারম'এর মতো উন্মাদ-প্রায় হিন্দুত্ববাদী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে গ্রহণযোগ্য যথেষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করেছে।

২০০৮ সনে সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং, লেঃ কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিত, দয়ানন্দ পান্ডে এবং মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশের অন্য আটজন বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রতিটি নতুন নতুন গ্রেফতারে নতুন নতুন সাক্ষ্য ও তথ্য বেরিয়ে আসে যা' হিন্দুত্ববাদী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে সংগ্রহীত বিদ্যমান অভিযোগকে যথার্থ হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের অপকর্মের গোলকধাঁধার অজানা তথ্যগুলো বেরিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা আরএসএস'এর কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

কমিটির সদস্য ইন্দ্রেস কুমারের মতো ব্যক্তিবর্গের নামও প্রকাশ হয়ে যায়। ২০০৭ সনের ৯ জুন শুরু হওয়া মক্কা মসজিদে বোমা হামলার দীর্ঘ তদন্ত সিবিআই হায়দারাবাদ পুলিশের কাছ থেকে গ্রহণ করে।

২০০৭ সনের ১৭ মে মক্কা মসজিদে সন্ত্রাসী আক্রমণে নয় জন মুসলিম নিহত ও ৫০ জনের বেশী আহত হন। এ আক্রমণের অতি ক্ষুদ্র, তবে যে জটিল বৈজ্ঞানিক আলামত পাওয়া গেছে তা হলো — একটি নকিয়া ফোনসেট এবং এর ভেতরে থাকা একটি Vodafone SIM কার্ড। সেলফোনটি ছিল একটি IED (Improvised Explosive Device)'এর অংশ বিশেষ, যা বিস্ফোরিত হয় নি। ফলে এ সেলফোনটি তদন্ত পরিচালনার একমাত্র সূত্র হয়ে দাঁড়ায়।

মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ মামলার তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই গ্রহণ করার পর, দায়িত্ব প্রাপ্তরা দেখতে পান যে, মক্কা মসজিদ বোমা বিস্ফোরণ ও সমঝোতা এক্সপ্রেস'এ সন্ত্রাসী আক্রমণের মধ্যে কমপক্ষে দুটো অভিন্নতা রয়েছে। ২০০৭ সনের ১৯ ফেব্রুয়ারী সমঝোতা এক্সপ্রেসের দুটি বগিতে পর পর তিনটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। সপ্তাহে দুই বার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলাচলকারী পাকিস্তানগামী এ এক্সপ্রেস ট্রেনে নতুন দিলী থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরবর্তী দেওয়ানা রেল স্টেশন অতিক্রমকালীন মধ্যরাতে বিস্ফোরণ ঘটে।

হায়দারাবাদের মক্কা মসজিদে একটি বোমা অকেজো হয়ে যায়। অন্যদিকে সমঝোতা এক্সপ্রেসে তিনটি অবিস্ফোরিত IED পাওয়া যায়।

কৌতুহলের ব্যাপার হলো মক্কা মসজিদে অবিস্ফোরিত IED'টিতে ৬.৫৩ বোল্টের যে ব্যাটারী পাওয়া গেছে সমঝোতা এক্সপ্রেসে পেতে রাখা IED গুলোতেও ঠিক একই ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারী ছিল। এছাড়া মক্কা মসজিদে ব্যবহৃত বোমা বিস্ফোরক রাখার জন্য যে ধাতব খোলক বা আধার ব্যবহার করা হয়, সমঝোতা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে উদ্ধার করা IED-সমূহের আধারের বহিরাবরণও একই ধরনের ধাতু-নির্মিত ছিল। ২০০৬ সনের এপ্রিল মাসে মহারাষ্ট্রের নানদেদে জনৈক হিন্দুত্ববাদী চরমপন্থীর বাসগৃহে আরএসএস সদস্য ও বজরংদলের একজন সক্রিয় কর্মী বোমা তৈরীর সময় নিহত হবার

www.pathagar.com

পর সেখান থেকেও একই ধরনের ধাতব-নির্মিত আধার উদ্ধার করা হয়। তদন্তে আরো জানা যায়, হিন্দু জঙ্গীরা ২০০৩ ও ২০০৪ সনে জালনা ও পারবহানি'র বেশ কিছু মসজিদের বাইরে যেসব বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়, সেগুলোও একই ধরনের ছিল।

২০০২ সনের ডিসেম্বর মাসে ভূপাল রেল স্টেশনের কাছে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের ধর্মীয় সমাবেশ 'ইজতেমা' হতে অর্ধ ডজনের বেশী সক্রিয় (লাইভ) পাইপ বা সেল বোমা উদ্ধার করা হয়।

নানদেদ, জালনা, পারবহানি, ভূপাল, সমঝোতা এক্সপ্রেস ও মক্কা মসজিদে বোমায় ব্যবহৃত সবগুলো খোলক বা আধারের নকশা (ডিজাইন) ছিল অভিন্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এসব ঘটনার পেছনে একই গ্রুপ জড়িত ছিল।

কৌতুকোদ্দীপক ঘটনা হলো, ২০০৫-২০০৮ সনের মধ্যে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ও হিন্দু মন্দির। যেমন ২০০৫ সনে দিলীতে দেয়ালী চলাকালীন বিস্ফোরণ, ২০০৬ সনে সঙ্কটমোচন মন্দিরে বিস্ফোরণ এবং ২০০৭ সনে হায়দারাবাদে একজোড়া বোমা বিস্ফোরণে ব্যবহৃত বোমাগুলোর নকশা (ডিজাইন) মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বোমার নকশা থেকে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন ধরনের ছিল।

অবশ্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ২০০৬ সনের মালেগাঁও সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ, সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ও মক্কা মসজিদ আক্রমণের মতো সন্ত্রাসী হামলায় হিন্দু জঙ্গীবাদীদের জড়িত থাকার সম্ভবনার ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী ভারতীয় সংস্থাগুলোর অবস্থান দ্বিধা-বিভক্ত ছিল।

সমঝোতা এক্সপ্রেস ট্রেনে বিস্ফোরণে লস্কর-ই-তইব্যা (LeT) এবং মক্কা মসজিদে হামলায় হরকত-উল- জিহাদ-আল-ইসলামী (HUJI) জড়িত থাকার ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের কাছে রহস্যাবৃত তথ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকাকালীন সিবিআই'এর তদন্ত ফরসনিক ট্রায়াল'এর আশ্রয় নেয়।

মক্কা মসজিদে ব্যবহৃত IED-তে এমন দুই-জোড়া ধাতব আধার ছিল, যাদের উভয় প্রান্ত বন্ধ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য ধারণ করার উদ্দেশ্যে এক প্রান্তে ছোট ছিদ্র ছিল। মক্কা মসজিদে ব্যবহৃত বিস্ফোরকের সাথে উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন

www.pathagar.com

প্রাণ-নাশক 'আরডিএক্স' এবং ট্রাইনাইট্রোটলিউঈন (TNT)'এর মিশ্রণ ছিল। এ দুটো বিস্ফোরক দ্রব্যই কেবলমাত্র সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীর কাছে থাকে। ৬.৫৩ ভোল্টের একটি ব্যাটারী বিস্ফোরক ভর্তি দুটি ঢালাইকৃত লোহার নির্মিত আধারের শেষ প্রান্তের ছিদ্র দিয়ে ডেটোনেটরের সাথে যুক্ত ছিল। ব্যাটারিটি একটি বৈদ্যুতিক সার্কিটের সাথে যুক্ত ছিল, যার সাথে আবার নোকিয়া ৬০৩০ সেলফোনের সংযোগ করা হয়। ফোনের সাথে ১.২২ পিএম সময় বেঁধে দেয়া টাইমার ছিল। ফলে সেলফোনটি একাধারে টাইমার ও সার্কিটে চাপ দেয়ার শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে যা' চূড়ান্ত IED'এর বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রতিটি IED সুনিপুণভাবে লৌহ নির্মিত কালো বাক্সের ভেতরে রাখা হয়। আর বাক্সটি রেকসিনের ব্যাগে রাখা ছিল। আন্তর্জাতিক মোবাইল যন্ত্র সনাক্তকারক (International Mobile Equipment Identifier — IMEI), হলো একটি অনন্য ব্যবস্থা যাতে প্রস্তুতকারী কোম্পানী ১৫-ডিজিটের আন্তর্জাতিক সংখ্যা বা নম্বর প্রতিটি সেলফোনকে দিয়ে থাকে। এ কারণে ৬০৩০ নোকিয়া সেলফোনটিতে এ মর্মে রেকর্ড ছিল যে, ফরিদাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী সেটটি বিক্রি করেছিল। সিবিআই'এর গোয়েন্দারা বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে যে, ক্রেতা একই ধরনের দুটো নোকিয়া ৬০৩০ ফোন ক্রয় করেছিল। হ্যান্ডসেটের ভেতরে পাওয়া Vodafone SIM কার্ড পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জন শহরের সারগ্রম অডিও ভিশন নামক একটি দোকানকে বিক্রি কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে। দোকানটিতে সংরক্ষিত রেকর্ড মতে সিমকার্ডটি ২০০৬ সনের জুন মাসে বাবু লাল ইয়াদব নামক জনৈক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়। বস্তুতঃ এ ক্রয় ছিল জালিয়াতিমূলক।

যাচাই করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে সিমকার্ড কেনার সময় যে ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছিল, তা ভূয়া এবং বাবু লাল ইয়াদব নামটিও কল্পিত।

সিমকার্ড বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ দুটো সেট থেকে কোন ব্যক্তিকে কোন কল করা হয় নি, বা কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোন কলও আসে নি।

এরপর সিবিআই প্রতিটি সেলুল্যর সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এ মর্মে চিঠি

www.pathagar.com

লেখে যে, বাবু লাল ইয়াদব'এর নামে আরো কোন সিমকার্ড কেনা হয়েছে কি না। পরবর্তীতে দেখা গেছে সর্বমোট ১১টি সিমকার্ড'এর ক্ষেত্রে একই নাম কিংবা একই ছবি ও ভূয়া ঠিকানা এবং পরিচয়পত্র ব্যবহার করা হয়েছে। ২০০৬ সনের জুন ও ডিসেম্বর মধ্যবর্তী সাত মাসের মধ্যে সাতটি দোকান থেকে এগুলো ক্রয় করা হয়েছে। এদের মধ্যে তিনটি দোকান ছিল পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলায়। আর বাকী চারটি দোকান ছিল ঝাড়খন্ডের জামতারায়।

তদন্তে আরো দেখা গেছে, ১১টি সিমকার্ডই নয়টি হ্যান্ডসেটে ব্যবহার করা হয়েছিল। যেসব দোকান থেকে এসব সিমকার্ড ক্রয় করা হয়েছে, সিবিআই তাদের সবগুলোই চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। এতে দেখা গেছে দুটো হ্যান্ডসেট বর্ধমানের ফরিদাবাদ (যা উপরে উলেখ করা হয়েছে) ও জামতারা থেকে তিনটি করে এবং একটি দিলীর গাফ্ফার মার্কেট থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

যেসব দোকানীর কাছ এসব সিমকার্ড ও সেল ফোন ক্রয় করা হয়েছে, সিবিআই তাদের সবার বক্তব্য লিপিবদ্ধ (রেকর্ড) করেছে। কিন্তু সিমকার্ড ও সেলফোন ক্রেতাদের পরিচয় রহস্যাবৃত থাকার কারণে এ উদ্যোগ শীঘ্রই হিমাগারে চলে যায়।

মক্কা মসজিদ তদন্ত সমাপ্তি হবার প্রাক্কালে মুসলমানদের পবিত্র রমজান চলাকালে ২০০৭ সনের ১১ অক্টোবর আজমীর শরীফের দরগা'য় একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে তিনজন নিহত এবং এক ডজনের বেশী মানুষ আহত হন।

মক্কা মসজিদের মতোই দুর্ভাগ্যক্রমে একটি IED অকোজে হয়ে যাওয়ায় তা' বিস্ফোরিত হয় নি। এ IEDটি ছিল মক্কা মসজিদে ব্যবহৃত IED' এর অবিকল প্রতিরূপ।

রাজস্থান এটিএস পরিচালিত তদন্তে দেখা গেছে অবিস্ফোরিত বোমায় ব্যবহৃত সিমকার্ড ও সেলফোন পরবর্তীকালে সিবিআই পরিচালিত তদন্তেও একই তথ্য বেরিয়ে আসা একই সিরিজের সিমকার্ড ও সেলফোনের (১১টি সিমকার্ড ও নয়টি হ্যান্ডসেটে) অন্তর্ভূক্ত ছিল।

www.pathagar.com

এতে এ বিষয়টি পরিস্কার হয় যে, মক্কা মসজিদ ও আজমীর শরীফে ব্যবহৃত বোমা হামলা একই সন্ত্রাসী চক্রেরই অপকান্ড। এ কারণে রাজস্থান এটিএস ও সিবিআই ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে তদন্ত চালায়। বাকী পাঁচটি সেলফোন (চারটি এর আগেই মক্কা মসজিদ ও আজমীর শরীফে ব্যবহৃত হয়েছিল) উদ্ধার করার জন্য অভিযান চালানো হয়।

দুটো সংস্থাই মরিয়া হয়ে বাকী সেলফোনগুলো উদ্ধারে অন্ধের মতো হাতড়িয়ে বেড়ানের প্রেক্ষাপটে ২০০৮ সনের ২৯ সেপ্টম্বর মালেগাঁও'এর মুসলিম অধ্যুষিত ভিক্ষুচকে মোটর সাইকেলে লুকিয়ে রাখা একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। প্রায় একই সময়ে যুগপৎভাবে গুজরাটের মোদাসা নামক একটি ছোট্ট শহরেও বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। মালেগঁও'এর মতোই বোমাটি একটি মটর সাইকেলে লুকানো ছিল এবং বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটেছিল একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে যখন রমজানের তারাবীর নামাজ চলছিল।

মহারাষ্ট্র এটিএস'এর তৎকালীন প্রধান হেমন্ত কারকারির নেতৃত্বে এসব বোমা হামলার ব্যাপারে প্রশংসনীয় ফরেনসিক তদন্ত চালিয়ে মালেগাঁও বোমা হামলায় ব্যবহৃত মটর সাইকেলের চেচিস নম্বর উদ্ধার করে। এতে দেখা যায়, মটর সাইকেলটির মালিক ছিল স্বঘোষিত হিন্দু নেত্রী সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। তাকে গ্রেফতারের পর লেঃ কর্নেল পুরোহিত, হিন্দু ধর্মীয় নেতা দয়ানন্দ পান্ডেসহ অন্যান্যদের গ্রেফতার করা হয়।

পান্ডের ল্যাপটপ থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য-সম্বলিত ৩৭টি অডিও এবং তিনটি ভিডিও ফাইল উদ্ধার করা হয়। পান্ডে তার ল্যাপটপে থাকা ওয়েব ক্যামেরা এবং অডিও রেকর্ডিং সুবিধা ব্যবহার করে পান্ডে, পুরোহিত এবং অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসী চক্রান্তের সভার সমুদয় বক্তব্য গোপনে রেকর্ড করে।

এসব রেকর্ডিং হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী চক্রান্তের বিশদ প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হয়। একটি অডিও ফাইলে অভিযুক্তদের অসীমানন্দ প্রসঙ্গে অতীব প্রশংসাপূর্ণ প্রদীপ্ত কথোকপথন শোনা যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, অসীমানন্দ অভিযুক্তদের বেশ পরিচিত।

সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং গ্রেফতার হবার খবর শুনে অসীমানন্দ আত্মগোপনে যায়।

www.pathagar.com

প্রজ্ঞা জানায়, মধ্য প্রদেশ আরএসএস'এর তিন প্রচারক — সুনীল যোশী, রামচন্দ্র কালচানগ্রা এবং সন্দীপ দাঙেরও মূল চক্রান্তকারীদের অন্যতম। ২০০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে যোশী রহস্যজনক পরিস্থিতিতে খুন হলে এটিএস তাদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হবার আগে কালচানগ্রা ও দাঙে আত্মগোপন করে।

২০০৯ সনের জুলাই মাসে এটিএস সনাক্ত করতে সক্ষম হয় যে, খোঁজ করতে থাকা পাঁচটি সেলফোনের মধ্যে চারটি মধ্য প্রদেশের শাহজাপুর জেলার কালাপিপাল তহসিলের চাপরি ও খারদান নামক দুটো গ্রামের একদল আরএসএস কর্মী ব্যবহার করছে। এটিএস সেলফোনগুলোর IMEI নাম্বারের সাহায্যে এ ফোনগুলো সনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

আরএসএস'এর কর্মীদের মধ্যে যারা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ে তারা হলো চন্দ্রশেখর লিভি, বিষ্ণু পতিদার, রবীন্দ্র পতিদার ও সন্তোষ পতিদার।

তদন্তে বেরিয়ে আসে যে, পলাতক আসামী দাঙে লিভির ঘনিষ্ঠ বন্ধু । ২০০০ ও ২০০৬ সনের মধ্যবর্তী সময়ে দাঙে আরএসএস'এর শাহজাপুর জেলা প্রচারক থাকাকালীন একই জেলার জেলা সম্পর্ক প্রমুখ পদে ছিল।

রাজস্থান এটিএস আরএসএস'এর অর্ধ ডজনের বেশী কর্মীর জবানবন্দী বাণীবদ্ধ করেছে। তারা বলেছে, আত্মগোপনে যাবার আগে দাঙে লিভির কাছে চারটি সেলফোন হস্তান্তর করে। অকেজো হবার কারণে লিভি একটি সেলফোন ফেলে দেয়, সে এবং তার সহযোগীরা বাকী তিনটি ফোন ব্যবহার অব্যাহত রাখে।

লিভি ও পতিদারদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে ২০১০ সনে এপ্রিল মাসে দেবেন্দ্র গুপ্ত গ্রেফতার হয়। গুপ্ত মূলতঃ আজমীর শরীফের অধিবাসী। কিন্তু সে মধ্য প্রদেশ ও ঝাড়খন্ড আরএসএস'এর বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে এ গ্রুপের পক্ষে কাজ করে। ২০০৫ থেকে ২০০৭ সনের মধ্যবর্তী সময়ে জামতাদাস্থ আর এস এস কার্যালয়ে যোশী, কালচানগ্রা ও দাঙের সফর সম্পর্কে গুপ্ত বিশদ বিবরণ প্রদান করে। ঐ সময়ে গুপ্ত জেলা প্রচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিল।

www.pathagar.com

গুপ্ত জানায় যে, এসব সফরের সময় সে তাদেরকে ভূয়া পরিচিয়পত্র ও ঠিকানা এবং সিমকার্ড সংগ্রহে সাহায্য করে। উপরে বর্ণিত সবগুলো সিমকার্ড পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান এবং ঝাড়খন্ড জেলার যথাক্রমে চিত্তরঞ্জন ও মিজহাম নামক দুটি সীমান্তবর্তী শহর থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

জামতাদায় গুপ্তের সাথে দেখা করতে আসা যোশী, কালচানগ্রা ও দাঙেকে দেখেছে এমন বহু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের বক্তব্য বাণীবদ্ধ করা হয়েছে। যোশীর সাথে গুজরাটের ভালসাদ'এর বাসিন্দা ভারত রিতেশ্বর নামক জঙ্গী হিন্দু জামতাদা অফিস পরিদর্শনে আসে যখন বোমা বিস্ফোরণের সমুদয় লজিস্ট্রিক সহযোগিতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।

এটিএস রিতেশ্বরকে খুঁজে বের করে। রিতেশ্বর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রদান করে, যা এটিএস কর্তৃক ইতোমধ্যে তথ্যকে সত্যি হিসেবে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। জিজ্ঞাসাবাদে গুপ্তের বক্তব্য ইন্দোরবাসী আরেকজন আরএসএস কর্মী লোকেশ শর্মার ভূমিকা প্রকাশ পায়। এটিএস'এর মতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় শর্মা সন্ত্রাসী দুষ্কর্মে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করে।

রিতেশ্বর ও গুপ্ত এ প্রথম বারের মতো পুলিশের কাছে স্বীকার করে যে, আরএসএস'এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইন্দ্রেস কুমার সন্ত্রাসী দুষ্কর্মের মূল হোতা যোশীর মুরুব্বী ও অর্থ সরবরাহকারী।

রিতেশ্বর পুলিশকে আরো জানায় যে, যোশীর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রতি ইন্দ্রেসের অনুমোদন ছিল। শর্মা আরো এক ধাপ এগিয়ে পুলিশকে বলে যে, সন্ত্রাসী কাজ চালানোর জন্য ইন্দ্রেস নিয়মিত যোশীকে অর্থ সরবরাহ করত।

২০১০ সনের সেপ্টম্বর মাসে মধ্য প্রদেশ পুলিশ শিভাম দাকাদ নামক জনৈক আরএসএস সক্রিয়বাদীকে গ্রেফতার করে, যে একটি খুনের ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। পুলিশ হেফাজতে সে পুলিশকে জানায়, সেও সুনীশ যোশীর নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ভাগীদার ছিল।

আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, ২০০৬ সনের ২৬ অক্টোবর জয়পুরের 'গুজরাটী সমাজ আতিহিগ্রা' নামক পত্রিকার রেস্ট হাউজে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

দাকাদ কথা বলেছে। ঐ বৈঠকে ইন্দ্রেস কুমারও আসে। দাকাদ'এর দেয়া বক্তব্য অনুযায়ী সাধ্বী প্রজ্ঞা, কালচানগ্রা, দাঙে এবং যোশীও ঐ সভায় উপস্থিত ছিল।

দাকাদের বক্তব্য বিশ্বাস করা হলে মেনে নিতে হবে, ইন্দ্রেসই সবাইকে একত্রিক হতে বলেছে। "আর এস এস তোমাদের আদর্শ ও কাজকর্মকে সমর্থন করে না। সুতরাং তোমরা অন্য কোন ধর্মীয় সংগঠনের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের কাজ চালিয়ে নিতে পার।"

২০১০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সিবিআই মধ্য প্রদেশের মৌ' (Mhow) বাসী আএসএস'এর নেতৃস্থানীয় কর্মী রাজেশ মিশ্র'এর বক্তব্য বাণীবদ্ধ করে। একটি ফাউন্ড্রী'র মালিক রাজেশ মিশ্র যোশীর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল। অনুসন্ধানী দলের কাছে সে স্বীকার করে যে, সে যোশীকে ১৫টি ঢালাইকৃত লোহার পাইপ দিয়েছিল, যাদের মাঝখানে খাঁজ-কাটা ছিল। ভূপাল ইজতেমায় ব্যর্থ সন্ত্রাসী হামলায় ঐসব পাইপ ব্যবহৃত হয়েছিল।

২০১০ সনের ১৯ নভেম্বর স্বামী অসীমানন্দ তার হরিদ্বারের গোপন আখড়া হতে গ্রেফতার হয়। তার গ্রেফতারের ঠিক একমাস পর অসীমানন্দ দিলীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হিন্দু জঙ্গীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সম্পর্কে খোলামেলা জবানবন্দী প্রদান করে, যেগুলোতে সে জটিল ভূমিকা পালন করে।

অসীমানন্দের সুচিন্তিত অভিমত ছিল: ২০০৬ সনে মালেগাঁও বিস্ফোরণ, সমঝোতা ট্রেনে হামলা, মক্কা মসজিদ ও আজমীর শরীফে বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতির সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের পেছনে মুসলমানরা নয়, বরং একদল আরএসএস প্রচারক জড়িত ছিল।

অসীমানন্দ স্বীকার করে যে, সে নিজেই মালেগাঁও, হায়দারাবাদ ও আজমীর শরীফ দরগা'কে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু (টার্গেট) হিসেবে বেছে নেয়। অন্যদিকে সুনীল যোশী সমঝোতা এক্সপ্রেসে হামলা চালানোর দায়িত্ব নেয়।

সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের চক্রান্ত বাস্তবায়নের পন্থা নির্ধারণ করার ব্যাপারে সে তার সাথে ইন্দ্রেস কুমারের কথোকপথন পুনর্ব্যক্ত করে। অসীমানন্দের ভাষ্যমতে ইন্দ্রেস বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য যোশী ও অন্যান্যদের আরএসএস

www.pathagar.com

সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত করে এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বাস্তবায়নে জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অংশ বিশেষ প্রদান করে।

তেহেলকা সাময়িকীতে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করার সময় পর্যন্ত মহারাষ্ট্র ও রাজস্থান এটিএস ২০০৮ সনে মালেগাঁও এবং ২০০৭ সনে আজমীর শরীফে বিস্ফোরণ ঘটানোর ব্যাপারে অভিযোগপত্র (চার্জশীট) দাখিল করে। কিন্তু সিবিআই ও জাতীয় তদন্ত সংস্থা (National Investigating Agency — NIA) মক্কা মসজিদ ও সমঝোতা এক্সপ্রেস ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ মামলার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।*

www.pathagar.com

বিচারপতি হসবেট সুরেশ'এর বিবেকতাড়িত মন্তব্য

আলোচ্য গ্রন্থের সাথে ভারতীয় সাবেক বিচারপতি হসবেট সুরেশ'এর একটি ভাষণের অংশ বিশেষ সন্নিবেশিত হয়েছে। ঐ ভাষণে তিনি ভারতের সার্বিক নাজুক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত অথচ বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। মুম্বাই হাইকোর্টের সাবেক বিচারক, মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক ও কলামিস্ট হসবেট 'সুরেশ মুম্বাইতে ডঃ জাকির নায়েক আয়োজিত 'সন্ত্রাস কি মুসলমানদের একচেটিয়া সম্পত্তি?' শীর্ষক এক বক্তৃতামালায় প্রধান অতিথি হিসেবে যে বক্তব্য রাখেন, অনেকেই তাকে কিছু কিছু ভারতীয় নাগরিকের আত্মোপলব্ধিপ্রসূত ও বিবেকতাড়িত জবানবন্দীই হিসেবেই বিবেচনা করেন। তিনি বলেন:

বন্ধুরা, আমি শুরুতেই ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বিচারক লর্ড টার্নিগের প্রসঙ্গ উলেখ না করে পারছি না। তিনি একবার একটা কথা বলেছিলেন — "বিচারকরা অভিনেতাদের মতো অন্যকে খুশি করার জন্য, উকিলদের মতো মামলায় জেতার জন্য, ঐতিহাসিকদের মতো অতীতকে জানার জন্য কথা বলে না; বরং বিচারকরা কথা বলে রায় দেয়ার জন্য।" --- অবশ্য আমি এখানে কোন রায় দেব না শুধু কথা বলব। আমি মানুষের বাক-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, তাই মানুষের অধিকার নিয়ে আগেও কথা বলেছি। আমি সব সময় চেয়েছি বিচাকর এসব বিষয়ে কথা বলুক। কারণ তারা যদি এসব অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ না করে তা'হলে কেইবা এর প্রতিবাদ করবে? আমাদের কাছে এটা এখন প্রমাণিত সত্য যে, সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জবাব দিতে গিয়ে প্রত্যেক দেশের সরকার আরো বেশী সহিংসতার জন্ম দেয়। আর এভাবেই এটা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। এভাবে এ পদ্ধতিতে সন্ত্রাস দমন তথা এ জাতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

টাডা আইনের প্রহসন

১৯৮৪ সালে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় বেশ কিছু বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল যেটা করেছিল খালিস্থানীরা। সে সময় সন্ত্রাসী গ্রুপ খালিস্থানীদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে ভারতের বিদ্রোহ চলছিল, তখন আমরা 'টাডা' নামক একটা আইন প্রণয়ন করি যেটা ছিল খুবই কঠোর। আপনারা জানেন যে, 'টাডা'র অনেক অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ হয়েছে। এই আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক নিরীহ মানুষকে আটক করা হয়েছে। তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। আমার মনে পড়ে পাঞ্জাব হাইকোর্টের একজন প্রবীণ বিচারপতি অজিত সিং বেইন্‌স্ একটা সমাবেশে তৎকালীন সময়ে ভারতে চলমান অত্যাচার-নির্যাতন নিয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, একদিন আমরা এই আইন থেকে মুক্তি পাব। উক্ত 'টাডা' আইনে দেশের সংহতি নিয়ে একটা বিষয় ছিল। সেটা হচ্ছে — দেশের সংহতি নষ্ট হয় এমন কোন কথা, কোন মন্তব্য কেউ করতে পারবে না — এটা আইনতঃ অপরাধ। তাই বিচারক অজিত সিং আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন — আমরা এই আইন তথা এই অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পাব।

তাকে আটক করা হল এবং তাকে পরানো হলো হাতকড়া। হাইকোর্টের বিচারকরা জামিন দিতে পারল না। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন। সেখানেও জামিন বা মুক্তি না পেয়ে তিনি জেলখানার মধ্যে কাটালেন এক বছরের বেশী সময়। আর সবশেষে দেখা গেল এটা কোন কেইস বা মামলা নয়। 'টাডা' নামক আইনের ক্ষমতাবলে ৭৫ হাজারের বেশী মানুষকে আটক করা হয়েছিল। সবাই ছিল জেলখানায়। কাউকেই জামিন দেয়া হয়নি। এই আইনের আওতায় পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভয়ংকর সব নির্যাতন চালাত। তারপর ১৯৯৫ সালে ভারত সরকার 'টাডা' নামক এই জঘন্য আইনটিকে বাতিল ঘোষণা করল। তখন দেখা গেল হাজার হাজার মানুষের ওপর অত্যাচার অবিচার করা হয়েছে। ৭২ হাজার বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া হল যাদের মামলা, বিচার কিছুই হলো না। শুধু তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জেলখানার ভেতরে অত্যাচার সহ্য করেছে।

তা'ছাড়া জঘন্য 'টাডা' আইনে আমরা দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছি মাত্র এক দশমিক আট শতাংশকে (১.৮%)। কিন্তু তারপরেও এক সময় এটা বলবৎ ছিল যার ফলে পুলিশ হয়ে গিয়েছিল স্বৈরাচারী। যা খুশি তাই করতে পারতো,

www.pathagar.com

কেউ কিছু বলতে পারতো না। রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই আইনকে ব্যবহার করত। যেকোন লোককে আটক করে জেলখানায় বন্দী করে রাখতে পরত এবং কোনভাবেই জামিন পাওয়া যেত না। অতঃপর ১৯৯৬ সালে 'টাডা' আইন বাতিল করা হলো কারণ এর বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। আমরা সবাই এর প্রতিবাদ করছি। এটা নিষ্ঠুর আইন। এ ধরনের কোন আইন আমরা চাই না। এ ধরনের আইন দিয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না; আরো বাড়বে।

'পোটা আইনের প্রহসন'

এরপর এলো ঘটল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সেই দুর্ঘটনা। নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ঘটে গেল এক প্রলয়ংকরী ঘটনা। মিঃ বুশ তৎক্ষণাৎ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো এবং বললো, যারা আমাদের সাথে নেই তারা আমাদের শত্রু। তখন আমরা আমেরিকা তথা বুশের পক্ষ অবলম্বন করলাম এবং "পোটা" আইন প্রণয়ন করলাম। এই আইনেও সে একই ঘটনা ঘটল। পোটা বহুমুখী আইন। এর আওতায় আপনি যে কাউকে আটক করতে পারেন। 'টাডা' আইনের ন্যায় এখানেও অনেক মানুষের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। চাই সে সন্ত্রাসী হোক বা না হোক। এমনকি তারা অনেকেই জানেনা তাদের অপরাধ কি? এ ধরনের আইন মানুষের মধ্যে শুধু আতঙ্ক বাড়ায়। এই কথাটা প্রাসঙ্গিক,কারণ মানুষ এখন 'পোটা' নিয়ে কথা বলে এবং 'পোটা'র মত আইন চায় না।

২০০৬ সালে বোম্বে ট্রেনের বোমা বিস্ফোরণ এবং তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সরকার উপলব্ধি করেছে যে, কঠিন কোন আইন ছাড়া সন্ত্রাস দমন করা যাবে না। কিন্তু আমি বলি, কঠিন কোন আইন দিয়ে সন্ত্রাস থামানো যায় না। এদেশে কেন? পৃথিবীতে এর নজির নেই। আমাদের দেশের এ 'পোটা' আইন দিয়ে সংসদেও (পার্লামেন্ট) বিতর্ক হচ্ছে। বিতর্কের এক পর্যায়ে ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদে আক্রমণ করা হলো। অবশেষে যখন এই আইনটা পাশ করা হলো, তখন কলকাতাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য কেন্দ্রে বোমা মারা হলো। এভাবে ২০০২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আকশারাধান

www.pathagar.com

মন্দিরে, ২০০২ সালের ২৪ নভেম্বর রঘুনাথ মন্দিরে, ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের ষাট কুপায় বুলুন্দে, ২০০৩ সালের ২৫ আগষ্ট "গেট অব ইন্দিয়ায়" বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই আইন (পোটা) থাকা সত্বেও একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটেই চলেছে। 'পোটা' আইন দিয়ে কোন লাভ হচ্ছে না।

২০০৩ সালে তৎকালীন ভারতের এ্যাটর্নি জেনারেল বলেছিলেন, সে বছর জম্মু ও কাশ্মীরে সব মিলিয়ে ৪,০৩৮টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছিল যদিও সেখানে আর্মি, নিরাপত্তা রক্ষী এবং এই আইনটা বলবৎ ছিল। সে সময়ই সেখানে ১,০০৭ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ৫০৮ জন অন্য দেশের নাগরিক। কাশ্মীরে গত ১৭ বছর পর্যন্ত মারা গিয়েছে ৮০ সহস্রাধিক মানুষ, হারিয়েও গেছে অনেকে। একই ঘটনা ঘটেছে পাঞ্জাবে। সে সময় পাঞ্জাবে খালিস্থানীদের বিদ্রোহ চলছিল। হাজার হাজার মানুষ হারিয়ে গেছে কেউ জানে না তাদের কি হয়েছে। এমন কি কয়েক বছর আগেও 'বিয়াস' নদীর তীরে অনেক লাশ, কংকাল ও মানুষের হাড়গোড় পাওয়া গেছে।

আমি একবার একটা তদন্ত করতে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে ঘুরে লোকজনের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম সেখানের বেশির ভাগ বাড়িতে বয়স্ক লোকজন, শিশু বাচ্চারা আছে, কিন্তু কোন তরুণ বা যুবক নেই। তাদের কি হয়েছে তাও কেউ বলতে পারে না। তারা শুধু এতটুকু জানে যে, গভীর রাতে তাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর তারা আর ফিরে আসেনি। এ ঘটনার আট দশ দিন পর বিভিন্ন জায়গায় তাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এমনই ছিল সেই আইন, যেখানে সহিংসতা ছিল একটি অবিরাম প্রক্রিয়া এবং খুনের পরিবর্তে খুন সেখানে অহরহ ঘটত। মনিপুর, ছত্রিশগড়, তেলেঙ্গানা এ রকম আরো অনেক জায়গায় খুনোখুনি, হত্যাকান্ড, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। সেদিন প্রধানমন্ত্রী বললেন — আমাদের একটা সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ প্রয়োজন।

অনেক দিন আগে কাশ্মীরে আমরা একটা পরীক্ষা করেছিলাম। তাদেরকে জেলখানার ভিতর আটকে রেখেছিলাম বছরের পর বছর। এরপর পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গেল। সরকার তাদের মগজ ধোলাই করে বললো —

www.pathagar.com

তোমরা ফিরে গিয়ে তোমাদের লোকদেরকে বোঝাও এভাবে যুদ্ধ করতে নিষেধ কর এবং ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব বদলানোর ব্যাপারে সহায়তা কর। তখন তারা বললো আমরা ফিরে গেলেই আমাদেরকে মেরে ফেলা হবে। তারপর আমাদের সরকার বললো আমরা অস্ত্র দেব। অবশেষে তারা অস্ত্র হাতে ফিরে গেল।

আমার মনে আছে, একবার নির্বাচনের সময় পাঞ্জাবে "ডেমোক্রেটিক রাইটস্ অর্গানাইজেশন" একটা প্রতবেদন ছাপাল। সেখানে বলা হলো যে, পাঞ্জাবে ভোট নেয়া হচ্ছে বন্দুকের মুখে, সেখানে সশস্ত্র সেনাবাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ আরো অনেক মানুষ দল, গোষ্ঠীর কাছে ব্যাপক অস্ত্র রয়েছে। এক কথায় ভারতের মানুষ এখন বন্দুকের মুখে, সহিংসতার জবাব সহিংসতা দিয়েই দিচ্ছে। এভাবে কি সমস্যার সমাধান সম্ভব?

ছত্রিশগড়ে অনেক মাওবাদী ও নকশালপন্থীরা আছে। তাদেরকে শেষ করার জন্য প্রায় ৫,০০০ আদিবাসী নিয়ে "সালওয় জুলুম" নামে একটা বাহিনী তৈরী করা হলো। এর ফলাফলটা দাঁড়াল আদিবাসীরা সব মারা গেল এবং নকশালপন্থীরা এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের একটু ভাবতে হবে, এখন পর্যন্ত এদেশে কোন সন্ত্রাসীর প্রকাশ্যে বিচার হয় নি, শুধু হত্যা করা হয়েছে। যেমন বোম্বাইতে ১৯৯৩ সালে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। এর আসল অপরাধী কারা তা বের করতে পারিনি। এর পাশাপাশি অনেক লোকজন জেলখানায় বন্দী হয়ে আছে বছরের পর বছর। কবেই বা তাদের মামলার শুনানী হবে, বিচার হবে, এ ব্যাপারে তারা কিছুই বলতে পারে না, এটাই বাস্তবতা। এছাড়া 'আকশারধাম' মন্দিরে আক্রমণ করা হয়েছিল। এখানে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের মেরে ফেলা হল। সংসদে এ বিষয়ে আলোচনা হলেও কাজটা আসলে কারা করেছিল তা' আমরা জানি না। এ ধরনের কাজই আমরা করে যাচ্ছি। সহিংসতার জবাব দিতে গিয়েই আমরা আরো বেশী সহিংসতার সৃষ্টি করেছি। এভাবেই চলছে দেশের জীবন ব্যবস্থা।

---- আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করা, তথা বিশ্বের মাঝে সন্ত্রাসের পরিচিতি তুলে ধরা। আর কিভাবে আপনি সন্ত্রাসের

www.pathagar.com

সংজ্ঞা দিবেন? 'টাডা', 'পোটা' এ সমস্ত তথাকথিত আইনেও সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দেয়া হয় নি। শুধু সন্ত্রাসী কাজের সংজ্ঞা দেয়া আছে । আর এ রকম কাজের কথা যথা — নরহত্যা, খুন, ডাকাতি, অস্ত্রবাজি, এসব ভারতের পেনাল কোর্ডে দেয়া আছে। কিছু সাধারণ আইনের আওতাভুক্ত রয়েছে; কিন্তু তারপরও পুলিশ তার নিজের সুবিধা মতো এ সব কাজকে সন্ত্রাসী কাজ বলে অভিহিত করছে।

এ কারণে সর্বত্র গোয়েন্দাগিরি বাড়ছে, যার ফলে পুরা দেশজুড়ে অবিচার বেড়ে চলেছে। পত্রিকায় আসছে যে, অ্যানটপ হিলে' একটা লাশ পাওয়া গেছে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে যেখানে কেউই ছিল না। কিভাবে জানি পুলিশ জানতে পেরেছিল লোকটা পাকিস্তানী এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হলো। কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই, তদুপরি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সমাজ মেনে নিল, কেউই প্রতিবাদ করে নি। কেন মারা গেল কেউ জানে না। আর পুলিশও এ ধরনের আইন চায় যেখানে প্রমাণের কোন বাধ্যবাদকতা নেই; বরং তারা যে কাউকে কোন প্রকার অভিযোগ ছাড়া তদন্তের নামে থানায় আটক রাখতে পারে। কিছুদিন আগে আমি সংখ্যালঘু কমিশনে গিয়েছিলাম। সেখানে লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আইনটা এখানে কি? আপনাকে থানায় নেয়া হলে আপনি যদি প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকেন, তা'হলে আপনার জবানবন্দী নেয়া হবে। অন্যথায় সন্দেহভাজন হিসেবে কোন রেকর্ডে আপনার নাম লেখা থাকবে। আপনার নাম তা'হলে এফআইআর' এ থাকবে। অথবা অন্য কোথাও থাকবে। কিন্তু আপনাকে থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ বলতে পারে না আপনি সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

আপনি আমাকে চেনেনই না, তার পরেও আমাকে আটকে রাখলেন, আমার ওপর নির্যাতন করলেন, অথচ এ ব্যাপারে কোন এ্যান্টি রেকর্ড নেই। তারপর একদিন আমার সাথে জুড়ে দিলেন একজন অপরিচিত পাকিস্তানী লোককে। তারপর বললেন, এরা দু'জনই একসাথে সন্ত্রাসী কাজ করে। এ হচ্ছে এখানকার নিয়ম। তাই এখানে নিরাপত্তার নামে পুলিশ যা খুশি তা'ই করতে পারে। ক্রস ফায়ারে কেউ কেউ মারা যেতে পারে। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে

www.pathagar.com

এখানে কোন তদন্ত হবে না। আপনার ওপর সব সময় নজরদারি করা সম্ভব। যেমন ধরেন আপনার ব্যাংক একাউন্ট তথা ব্যাংকের সব লেনদেন করতে হয় চেকের মাধ্যমে। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে বোম্বাইতে এখন নতুন নিয়ম হয়েছে যে, আপনি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন না, বাসা ভাড়া দিতে পারবেন না। যদি বাসা ভাড়া দিতে চান তা'হলে একজন পুলিশ অফিসারকে সব কিছু জানাতে হবে। এভাবে আমাদের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ক্রীতদাসে পরিণত করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে 'টাডা' আইনটা করা হয়েছিল যেটা ছিল নিষ্ঠুর ও অন্যায় — তথাপি নিরাপত্তার নামে এটা করা হয়েছিল। মেনকা গান্ধীর সেই ঘটনার পর কেউ এটার পক্ষে ছিল না। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট এটাকে সমর্থন করেছে, এবারও দোহাই ছিল নিরাপত্তা তথা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা। তারপর আসল 'পোটা' এবং সৈন্য বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন। এ আইন দিয়ে তারা উত্তর-পূর্ব ভারতের মনিপুর এলাকা ছারখার করে দিয়েছে। তারপরও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে আমরা এটা সমর্থন করি। আমরা উদারতা, সামাজিক ন্যায় বিচার সব কিছুই ভুলে গেছি। তাই আমাদের সবাইকে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, এই বিশৃংখলাকে আমাদের বন্ধ করতে হবে। তা'হলে এখানে সমাধানটা কি? অস্ত্র, সহিংসতা এখানে কোন সমাধান নয়, কারণ সহিংসতার সমাধান কখনো সহিংস হতে পারে না। এখন আমাদের সমাজে এতো সহিংসতা এতো সন্ত্রাস কেন হচ্ছে? এর পেছনের কারণটা কি? আর আমাদের সরকারকে যেটা বুঝতে হবে সেটা না অস্ত্র দিয়ে না এ সব নিষ্ঠুর আইন দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমাদের সমাজে এখনো অনেক বেশী অন্যায় অবিচার হয়, ভারতের সব জায়গায় অন্যায় হচ্ছে, বড়লোক আর ক্ষমতাবান লোকদের দ্বারা, তারা যা' খুশি তা'ই করে। কিন্তু তাদের কিছুই হয় না।

------- ভারতের বড় লোক আর ক্ষমতাবানরা কিছুই ভ্রুক্ষেপ করে না, তারা যা চায়, তা'ই পায়। কিন্তু গরীব অসহায়দের নিয়ে আমরা অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছি — কিন্তু কোন লাভ হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ নর্দমা বাঁধের কথাই ধরুন। তারা সবাই ঘরবাড়ি জমি হারিয়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হলো — এমনকি

www.pathagar.com

তাদের কিছুই অবশিষ্ট রইল না। অবশেষে মুম্বাইতে ৪০ লক্ষাধিক মানুষ বস্তিতে বসবাস শুরু করল। আমাদের সরকার ঐ বস্তিগুলো ভাঙছে। অথচ আপনার বাসস্থানের অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। একজন মানুষ হিসেবেও এটা আপনার মৌলিক অধিকার। আসলে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের অধিকার ভুলে যাওয়া হচ্ছে। সুপ্রীম কোর্টে এ কথা বলা হয়েছে ২০ নং আর্টিকেলে। মর্যাদার সাথে প্রাসঙ্গিক সব কিছুই আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজন। আমাদের পোশাক, বাসস্থান, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের শিক্ষা। কিন্তু আমরা এসব নিয়ে চিন্তা করছি না যে, সরকার আসলেই কোন কাজ বা কোন দায়িত্ব পালন করছে না, বরং ধীরে ধীরে সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিচ্ছে। এ অবস্থায় মানুষ কি করবে? যদি আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়, যদি আপনি আদালতে ন্যায় বিচার না পান, আপনি কি করবেন?

অন্ধ্রপ্রদেশে হাজার হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেছে। বার বার তারা আদালতে আপিল করেছে। সরকার এ ব্যাপারে উদাসীন, কিছুই করেনি। মানুষ এখানে কি করবে? তাদের উপায় কি হবে? এগুলোই এখন প্রশ্ন যার উত্তর নেই। মনে আছে একবার অরুন্ধতি রায় বলেছিলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষ যখন ন্যায় বিচার পায় না, কোন সাহায্য পায় না, সে সময় তারা এসব অত্যাচারকে অস্বীকার করতে চায়। রায়টের পরে একবার গুজরাটে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক ছোট ছোট শিশুদেরকে দেখেছি, যাদের মা-বোনদের ধর্ষণের পর পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কেউ তাদের গাইড করেনি , লেখাপড়া শেখায়নি, কেউ তাদের মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতা করেনি। আতঙ্কটা তখনো ছিল। তারা কি ন্যায় বিচার আশা করতে পারে? আমি অস্ত্র ধারনের বিরুদ্ধে কথা বলছি। তবে সরকারের একটা দায়িত্ব আছে, তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সরকার যদি ভুক্তভোগীদের সাহায্য না করে, তাহলে তারা নিজ থেকেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে এটাই আসল কথা, অরুন্ধতি রায় যেটা বলেছিলেন, যখন ভুক্তভোগী হতে চায় না তাদের বলা হয় সন্ত্রাসী। আর এভাবেই আমরা বিভিন্ন অন্যায়-অবিচারের শিকার হচ্ছি প্রতিদিন, প্রতি

www.pathagar.com

মুহূর্তে। আমাদের সরকারের এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তবে নিষ্ঠুর কোন আইন দিয়ে নয়, কোন একটা বিশেষ জাতির ওপর অত্যাচার চালিয়ে নয়, অবিচার করে নয়; বরং প্রত্যেক মানুষকে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, জীবিকা এসব মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে হবে। এসব অধিকার যদি নিশ্চিত করা হয়, আপনা থেকেই এ সমাজে একটা পরিবর্তন আসবে।*

www.pathagar.com

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গীবাদ

ভারতীয় সরকারী কর্মকর্তা, নীতি-নির্ধারক এবং তাদের বাংলাদেশী সেবাদাসরা উদ্দেশ্যেমূলকভাবে বাংলাদেশে সক্রিয় ইসলামী মৌলবাদের কথা প্রচার করে বেড়ায়। তাদের মতে কতিপয় রাজনৈতিক দলের সাথে মুসলিম জঙ্গীবাদীদের সম্পর্ক রয়েছে। ভারতীয় 'চর'দের উক্তি উদ্ধৃত করে সম্পূর্ণ মিথ্যে পরিসংখ্যান দিয়ে প্রচার করেছে যে, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকরি প্রাপ্তদের ৩৫ শতাংশই মাদ্রাসার ছাত্র। এই মিথ্যে তথ্য যদি সত্যিও হয়, তাতেও সেনাবাহিনীতে জঙ্গীবাদের অনুপ্রবেশ হচ্ছে এমন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা সেনাবাহিনীতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রমাণ ও শর্তাবলী পূরণে সক্ষম হলে সে সুযোগ হতে তাদের বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। সেনাবাহিনীতে নিযুক্তির আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির, এমনকি তার পরিবার ও দূর-আত্মীয়দের কর্মকান্ডের যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং জঙ্গীদের সেনাবাহিনী কেন, সাধারণ সরকারী চাকরি পাওয়াও সম্ভব নয়। মুসলমান হিসেবে নামায পড়া কিংবা মুখে দাঁড়ি রাখা, অথবা ইসলাম নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করা মোটেই জঙ্গীবাদ নয়। সুতরাং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মুসলিম জঙ্গীবাদ ঢুকে পড়েছে এ কথা মোটেই সত্যি নয়। অথচ ভারত এবং তার বাংলাদেশী দোসররা ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং অন্যত্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক জঙ্গী ও জঙ্গী সংগঠনের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ও উপস্থিতির বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেনা। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে এ ধরনের প্রচারণা কদাচিৎ দেখা যায় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কংগ্রেস থেকে শুরু করে কমিউনিষ্ট নাস্তিক্য, চরম হিন্দু উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, বজরং দল, ভারতীয় জনতা পার্টিসহ প্রায় প্রতিটি দল ও গ্রুপের কেবল সক্রিয় কর্মী-সমর্থকই নয়, রীতিমত গোপন সংগঠন রয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যেমূলকভাবে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক জঙ্গীদের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগের ব্যবস্থা করে যারা ভারতের ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখতে সৈন্য ও কর্মকর্তাদের মধ্যে হিন্দু

www.pathagar.com

ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ায়। ভারতীয় নীতি-নির্ধারকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে বর্ণ, পেশা, অঞ্চল ও রাজনৈতিক আদর্শ নির্বিশেষে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে তীব্র হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে বহুধাবিভক্ত হিন্দুদের সক্রিয় এক ও ঐক্যবদ্ধ করা। এই চেতনাবোধ উজ্জীবিত থাকলেই ভারতীয় হিন্দুরা জাতিগত ও বর্ণগত বিদ্বেষ এবং আঞ্চলিক রেষারেষি, তথা আর্থ-সামাজিক সমস্যা ভুলে গিয়ে ভারতকে কেবল ঐক্যবদ্ধই রাখবেনা, বরং চরম দারিদ্র ও সামাজিক সংকট সত্ত্বেও ভারতকে তথাকথিত পরাশক্তি হিসেবে বাহ্যিকভাবে হলেও প্রদর্শনার্থে অপ্রয়োজনীয় মাথাভারী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা যাবে। আর এভাবেই অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। মূলতঃ চরম মুসলিম-বিরোধী উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক চেতনা উজ্জীবিত রাখার কারণেই বহুধাবিভক্ত বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মাওবাদী যুদ্ধ বিগ্রহে বিধ্বস্থ ভারত আজো অখন্ড রয়েছে। আর এর নেপথ্য শক্তি হলো চরম হিন্দুত্ববাদী বিশাল ভারতীয় সেনাবাহিনী। অনাহারক্লিষ্ট রোগে অপুষ্ঠিতে পর্য্যদুস্থ ভারতীয়দের সামনে অখন্ড হিন্দু ভারতের মূলো ঝুলিয়ে ভারত প্রতি বছর সামরিক ব্যয় আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি করে চলেছে ।

চৌদ্দ লক্ষাধিক ভারতীয় সৈন্যদের প্রায় দশ লাখই ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। চরম হিন্দুত্ববাদী চেতনা থেকেই ভারতীয় সৈন্যরা নিজদের প্রবঞ্চিত ও উপেক্ষিত জনগণকে নির্মমভাবে নিমূর্ল করছে। উল্লেখ্য কাশ্মীর, পাঞ্জাব, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুনাচল প্রদেশ, আসাম, মেঘালয়ে যুদ্ধ হচ্ছে মূলত অহিন্দুদের বিরুদ্ধে। বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী দমনের নামে ভারতীয় সৈন্যরা এসব অঞ্চলে যে নির্মম কৌশল অবলম্বন করছে, তা সন্ত্রাসীদেরকেও হার মানায়। মাওবাদী গেরিলাদের দমনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী এখন আরো ১১টি রাজ্যে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। বিশ্বের অন্যকোন দেশের সেনাবাহিনী স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে এমন যুদ্ধে লিপ্ত নয়। উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিষবাষ্প অক্ষুণ্ন রেখে তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংস্থার চরমপন্থী ধর্মান্ধ হিন্দুদের

www.pathagar.com

পরিকল্পিত উপায়ে উদ্দেশ্যেমূলকভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। ভারতীয় এবং বিদেশী সংবাদপত্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক সাময়িকীর রক্ষণশীল কায়দায় প্রস্তুত প্রতিবেদনে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী উগ্রপন্থীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশের স্বীকৃতি রয়েছে। এসব প্রতিবেদন নিশ্চিত করে যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভেতরেই বিভিন্ন হিন্দু সাম্প্রদায়িক উগ্রপন্থী গোপন সংগঠন বহু বছর ধরে সক্রিয় রয়েছে। সেনাবাহিনী হতে অবসরপ্রাপ্ত এবং কর্মরত বহুসংখ্যাক কর্মকর্তা সেনাবাহিনীর ভেতরে উগ্রপন্থী গ্রুপগুলোকে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের মূল দায়িত্ব হলো প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বশাখায় উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে দেয়া ও উজ্জীবিত করা। বিজেপি, শিবসেনা, বজরং দল, দূর্গা বাহিনী, অভিনব ভারত, সনাতন শাস্ত্র, হিন্দুজন জাগৃতি সমিতি, আর এস এস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ), ভারতীয় হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) প্রভৃতি কট্টর হিন্দু সম্প্রদায়িক উগ্রবাদী দল ও গ্রুপ ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহে সক্রিয় রয়েছে, যেগুলো বাস্তব অর্থে তালেবান আলকায়দা'র চেয়েও জঘন্যতর। এগুলো তাদের অনুসারীদের ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। এ কারণে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে বিজেপি, আরএসএস, বিএইচপি, বজরং দল ও তাদের শাখাসমূহের হাজার হাজার অনুসারী ও কর্মী সক্রিয় রয়েছে। এই কারণেই প্রতিরক্ষা বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী, পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা সংস্থা হতে অবসর নেয়া অধিকাংশ কর্মকর্তা ও সাধারণ সদস্যরা প্রধানত বিজেপিতে যোগ দেয়। যুব অনুসারী ও সমর্থকদের ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থায় অফিসার হিসাবে যোগদানের যোগ্যতাসম্পন্ন করার জন্য আরএসএস মহারাষ্ট্রের নাসিক অঞ্চলে বনস্‌লা সামরিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এর শাখা রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত হিন্দুত্ববাদী কর্মকর্তারা এসব সামরিক একাডেমীতে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে। বিজেপি-আরএসএস পরিচালিত এসব ধর্মীয়-সামরিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও মনস্তাত্তিকভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে এসব হিন্দুত্ববাদে উদ্বুদ্ধ উগ্রবাদী হিন্দু যুবকরা নিযুক্তিমূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীতে চাকরি নেয়। (দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা ১৪ মে, ২০০৯)। তাদের অতীত শিক্ষা কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, কার্যক্রম, কিংবা তাদের রাজনৈতিক পরিচিত অথবা আর্দশ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন কিংবা আপত্তি উত্থাপন করেনা। অথবা ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহে কত শতাংশ সদস্য ধর্মীয়, আদর্শিক বা রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ বা পক্ষপাতমূলক এমন তথাকথিত জরিপ কেউ চালায়না।

বিজেপি-আরএসএস পরিচালিত 'বনস্‌লা' সামরিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়' ছাড়াও সংবাদ মাধ্যমে 'মহারাষ্ট্র মিলিটারী ফাউণ্ডেশন' 'আত্মঘাতক পাঠক' (Attaghatak Phatak) এর নাম এসেছে যার সাথে জড়িতরা ২০০৮ সনের নভেম্বর মাসে বোম্বাইয়ের দুটি হোটেলে সন্ত্রাসী হামলা চালায়। শিবসেনা প্রধান বাল ঠেকারের'র অনুসারী অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল প্রেমনাথ হান 'মহারাষ্ট্র' মিলিটারী ফাউণ্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা। ইহা মূলতঃ শিবসেনা'র একটি শাখা প্রতিষ্ঠান। সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকাকালীন জেনারেল প্রেমনাথ শিবসেনার সংস্পর্শে আসেন। জেনারেল প্রেমনাথের বিশ্বস্ত শিষ্য কর্নেল জয়ন্ত রাও চৈতাল 'আত্মঘাতক পাঠক'এর প্রতিষ্ঠাতা। জেনারেল প্রেমনাথ ও কর্নেল চৈতাল বহুদিন যাবত ভারতীয় সেনাবহিনী ও 'র' এর সামরিক নির্বাচন কেন্দ্রের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা সেনা সদস্যদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠনে টানতে সক্ষম হন।

জেনারেল প্রেমনাথ এবং কর্নেল চৈতাল যৌথভাবে একটি হিন্দু আত্মঘাতী স্কোয়ার্ড গঠন করে। সংগৃহীত রিক্রুটদের মুম্বাই থেকে ৫০ কি.মি. দূরবর্তী আম্বরনাথ শিল্পনগরীতে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। ৩০-সদস্য বিশিষ্ট প্রতিটি ব্যাচ (দল) কে ১৫দিন ধরে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। জেনারেল প্রেমনাথ ও কর্নেল চৈতাল স্বীকার করেছেন আত্মঘাতী দলের সদস্যরা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অন্তর্ঘাতমূলক হামলা চালায়। সবচেয়ে বিব্রতকর ও লোমহর্ষক বিষয় হলো ভারতের অভ্যন্তরে বিবিধ অপরাধ কর্মের সাথে প্রেমনাথ ও চৈতালের সংগঠনের জড়িত থাকার তথ্য পুলিশ বারংবার পেয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপের কারণে প্রত্যেক বারই পুলিশী তদন্ত মাঝপথে থেমে যেত। ২০০২ সনে চালানো এক তদন্তে চৈতালের সাথে যুগপৎভাবে সেনাবাহিনী ও হিন্দু সন্ত্রাসীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ উদঘাটিত হয়। কিন্তু চৈতালকে গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে অ্যান্টি টেরোরিষ্ট স্কোয়ার্ডকে মাঝপথে থেমে যেতে হয়। কারণ থেমে যাবার নির্দেশ 'র' থেকেই আসে। প্রকাশ হয়ে যাওয়া এক খবরে বলা হয়েছে,'র' হিন্দুত্ববাদী গ্রুপগুলোর প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসীদের ভারতের সব প্রধানমন্ত্রীর সময়ে ব্যবহার করেছিল। এই কারণেই 'র' মুসলমান, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ঘটানো সব অপরাধী হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের প্রশ্নে নমনীয় পন্থা অবলম্বন করে।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস, গোর্দা স্টেশনে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ, খ্রিস্টান হত্যা, মালেগাঁওতে বোমা হামলা, গুজরাটে মুসলিম বিরোধী গণহত্যা, পাকিস্তানগামী 'সমঝোতা' ট্রেনে বোমা হামলা এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সব সাম্প্রদায়িক লোমহর্ষক দাঙ্গায় হিন্দু উগ্রপন্থীদের জড়িত থাকার সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কর্নেল শ্রীকান্ত পুরোহিত গ্রেফতার হবার পর মালেগাঁওয়ে বোমা হামলা এবং 'সমঝোতা' এক্সপ্রেসে 'আরডিএক্স' ব্যবহার করে অগ্নিসংযোগ ও বোমা হামলার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। এসব খবরে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ যখন সয়লাব ঠিক সে মুহূর্তে ২৬ নভেম্বর (২০০৮) বোম্বাইয়ে পুনরায় বোমা হামলা চলে। তাজ্জবের ব্যাপার হলো বোমা হামলার ১৫ মিনিটের মধ্যে এ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়ার্ডের প্রধান হেমন্ত কারকারি নিহত হয়। তার নিহত হওয়াকে অস্বাভাবিক হিসেবে বর্ণনা করে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে অভিযোগ করে যে, ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্বাদীরাই তাকে হত্যা করে, যেহেতু তিনি মালেগাঁও বোমা হামলা এবং 'সমঝোতা' ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগ সংক্রান্ত ঘটনার তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন। তদন্তে অন্যান্যের মধ্যে এসব হামলার সাথে শ্রীকান্ত প্রসাদ পুরোহিতের জড়িত থাকার প্রমাণ বেরিয়ে আসে। লে.কর্নেল পুরোহিত জেনারেল প্রেমনাথের আত্মঘাতি দলের সদস্য ছিলেন। রমেশ উপাধ্যা নামক জনৈক মেজরও লে.কর্নেল পুরোহিতের সাথে অভিযুক্ত হন। সন্ত্রাস বিরোধী স্কোয়ার্ড

www.pathagar.com

'সমঝোতা এক্সপ্রেস' এ সন্ত্রাসী হামলা এবং মালেগাঁওতে বোমা হামলার সাথে আরো দুইজন কর্নেল জড়িত থাকার কথা ঘোষণা করে। এটিএস হিন্দু সন্ত্রাসীদের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে শীঘ্রই আরো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের ঘোষণা দেয়। ঠিক ঐ সময়ে মুম্বাইয়ে বোমা হামলা ঘটে। এই ঘটনার প্রাক্কালে এটিএসকে প্রদত্ত সরকারী সাহায্যর সহযোগিতা প্রদান হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কারকারিকে প্রায় প্রতিদিনই অজ্ঞাত স্থানে হতে হত্যার হুমকি দেয়া শুরু হয়। তাকে হত্যার নকশা এমনভাবে তৈরি হয়, যাতে হত্যাকান্ডের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের ওপর বর্তানো যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আত্মঘাতি পাঠককেই দায়ী করা হয়। এই ঘটনায় লে. কর্নেল পুরোহিতের সাথে পঞ্চমারিতে মোতায়েনকৃত প্যারাসুট রেজিমেন্টর বাঘাদিত্য জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল কাপুর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে সেনা কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেননি। (দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৮ এপ্রিল, ২০০৯) ।

মালেগাঁওতে বোমা হামলায় ছয়জন মুসলমান নিহত হন। মহারাষ্ট্র 'এটিএস' মালেগাঁও বোমা হামলা মামলার তদন্ত চালিয়ে আদালতে পেশকৃত ৪০০০ পৃষ্ঠার চাজশীর্টে ঐ হামালার সাথে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠনসমূহের জড়িত থাকার প্রমাণাদি উল্লেখ করে। ১০ জন পুরুষ ও একজন মহিলাকে এই মামলার আসামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এরা হলো কর্মরত লে.কর্নেল শ্রীকান্ত প্রসাদ পুরোহিত, হিন্দু সাধুমহন্তী অম্রিতানন্দ ওরূপে দয়ানন্দ পান্ডে, সাধ্ববী প্রজ্ঞাসিং ঠাকুর, শিবনারায়ণ সিং, শ্যাম বাওয়ার লাল সাহু, অবসারপ্রাপ্ত মেজর রমেশ শিবাজি উপাধ্যা, সমীর কুলকারনি, রাকেশ দত্তরাম, অজয় রাহিকার প্রমুখ। মেজর রমেশ উপাধ্যা ভারতীয় সংঘ পরিবারের সামরিক শাখা 'অভিনব ভারত' এর সাথে যুক্ত।

পুরোহিত নেতৃত্বাধীন চক্রের দায়িত্ব ছিল মুসলিম স্থাপনার ওপর হামলা চালিয়ে তার দায়-দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া। মুসলিম স্থাপনার ওপর পরিচালিত প্রতিটি হামলার পর এই মর্মে প্রচার চালানো হয়

www.pathagar.com

যে, মুসলমানরা বোমা তৈরী কিংবা ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর জন্য বোমা বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে মুসলিম স্থাপনা ধ্বংস হয় কিংবা মুসলমান মারা যায়। বোমা হামলার পরপরই অজ্ঞাত ব্যক্তি কোন মুসলিম সংগঠনের পক্ষ থেকে ফোন করে হামলার দায়িত্ব স্বীকার করত। বাস্তবে ঐসব ফোনকারী ছিল হিন্দু এবং মুসলমানদের ওপর হামলার দায়িত্ব চালানোর উদ্দেশ্যে মুসলিম ব্যক্তি ও সংগঠনের নাম ব্যবহার করে। এ ধরনের ভূয়া সংবাদ-প্রাপ্তির সাথে সাথে পুলিশ ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে সম্পূর্ণ নিরাপরাধ মুসলমানদের গ্রেফতার করে স্বীকোরুক্তিমূলক জবানবন্দি নেয়ার জন্য চরম নির্যাতন চালানো হয়। ভারতীয় সাময়িক 'ফ্রন্টলাইন' জানিয়েছেন, উগ্রবাদী হিন্দু সন্ত্রাসীরা মুসলিম মসজিদে হামলা চালিয়ে মুসলমানদেরকেই হামলার জন্য দায়ী করে।

'ফ্রন্টলাইন' জানায় নভেম্বর ২০০৩: মহারাষ্ট্রের পরবাহানিস্থ মোহাম্মদীয়া মসজিদের ভেতর বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

আগষ্ট ২০০৪: মহারাষ্ট্রের জালনাস্থ কাদেরীয়া মসজিদের ভেতর বোমা বিস্ফোরিত হয়। একই বছর মহারাষ্ট্রের মীরজাউল-উলুম মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণের ফলে অনেক ছাত্র জখম হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯: মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওতে মুসলিম অধ্যুষিত বিক্ষুক এলাকায় বোমা বিস্ফোরণে পাঁচজন নিহত এবং ৮৯ জন আহত হয়। (ANUPAMA KATAKAM, Frontline Chennai, India, November 22 to December 5, 2008) জিজ্ঞাসাবাদের সময় লে. কর্নেল পুরোহিত স্বীকার করে যে, ২০০৮ সনের ২৯ সেপ্টেম্বর সি.মি অফিসের সন্নিকটে বোমা পাতার জন্য সেসব ধরনের কৌশলগত সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয়বারের মতো নিদ্রাছন্ন অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে যে, ফরিদাবাদ-ভিত্তিক সন্ত্রাসী চক্র 'অভিনব ভারত' এর আধ্যাত্মিক গুরু কর্তৃক আর্দিষ্ট হয়ে সে ব্যক্তিগতভাবে মালেগাঁও হামলা পর্যবেক্ষণ করেছিল। পুরোহিত এবং 'অভিনব ভারত' এর সাফল্য এখানেই যে তারা মুসলিম বিরোধী হামলায় মুসলমানদেরকেই ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল।

www.pathagar.com

মালেগাঁও হামলায় পুরোহিত মাত্র ২৫ হাজার রূপী ব্যয় করেছিল। (Times of India, 13 November, 2008.)

সে স্বীকার করে সে, কাশ্মীরী মুসলিম অধ্যুষিত পুনার একটি এলাকা হতে সে আরডিএক্স বিস্ফোরক সংগ্রহ করে। সম্ভবত: এটাও ছিল তার মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরেকটি মিথ্যাচারিতা।

এটিএস দাবী করে যে, ২০০৭ সনের ১৭ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানগামী 'সমঝোতা' এক্সপ্রেস এ বোমা বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আরডিএক্স বিস্ফোরক সে ভগবান নামক জনৈক সন্ত্রাসীকে সরবরাহ করে যে হামলায় নিহত ৬৮ জন যাত্রীর অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানী নাগরিক। সরকারী উকিল অজয় মিশ্র বলেন, 'অভিনব ভারত'এর কোষাধ্যাক্ষ লে.কর্নেল পুরোহিতকে আড়াই লাখ রূপী প্রদান করে। কানিপুর হতে গ্রেফতারকৃত স্বঘোষিত পুরোহিত মহন্ত অমিতানন্দ দেব ঔরূপে দয়ানন্দ পান্ডে স্বীকার করে যে, তার নির্দেশে কর্নেল পুরোহিত মালেগাঁওতে ব্যবহৃত আরডিক্স বিস্ফোরক সেনাবাহিনীর অস্ত্রভান্ডার থেকে সংগ্রহ করেছিল। তথ্যমতে পান্ডে ভূপাল, জবলপুর এবং ফরিদাবাদে বোমা বিস্ফোরণ-পূর্ব সব গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিল। অতীব সর্তকতার সাথে অভিযানগুলো তদারকি করে এবং অবৈধ পন্থায় আসা অর্থায়নেও ছিল তার দায়িত্ব। বিশ্বাস করা হয় যে, ভারতের জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমী থেকে ঝরে পড়া পান্ডে এমন দু'জন অভিযুক্তদের সহযোগিতা করেছিল, যারা আত্মগোপন করেছে। এদের একজন ছিল রামজি কালসাঙ্গারা যে মালেগাঁও সামের ডাঙ্গায় অন্য সন্ত্রাসী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের নিজস্ব মোটর সাইকেলে বোমা পেতেছিল। চার্জশীটে সর্বাধিক ভীতিকর ও অবাক করার মতো প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ভারতকে পুরোপুরি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দশ্যে পুরোহিত ইসরাইলে একটি প্রবাসী সরকার গঠনের চক্রান্তে জড়িত ছিল। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, ২২ জানুয়ারী, ২০০৯)

পুরোহিতের পরামর্শ ছিল – ভারতের সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১৪ লাখ থেকে বাড়িয়ে এক কোটিতে উন্নীত করা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নাম হবে যুদ্ধমন্ত্রী। পান্ডের পরামর্শ ছিল পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করা উচিত নয়, যেহেতু তাদের পরিকল্পনায় এটা অখন্ড ভারতের অন্তর্ভূক্ত।

www.pathagar.com

বিদেশনীতির প্রশ্নে পুরোহিতের পরামর্শ, হারানো ভূখন্ড উদ্ধার কিংবা নিয়ন্ত্রণ রেখাকে আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে মেনে না নেয়া পর্যন্ত ভারত যুদ্ধে লিপ্ত এমন ঘোষণা দেয়া হোক। সে ইসলামী ও খ্রিষ্টান আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সমন্বয়ে ঐক্য গড়ে তোলার পরামর্শ দেয়।

অন্যদিকে পুরোহিত বাংলাদেশে সন্ত্রাসী গ্রুপ গঠনের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক হিন্দুকে জোগাড় করে। প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে পুরোহিত কলিকাতায় বাংলাদেশী হিন্দু সন্ত্রাসীদের একটি সভায় অংশ নেয়ার আমন্ত্রণ জানায়। এসব কিছু প্রমাণ করে যে, সে তার অজ্ঞাত ভারতীয় এবং এর বাইরের, সম্ভবত: ইসরাইলী, প্রভুদের কাছ থেকে শক্তি সমর্থন পাচ্ছিল।

২৯ সেপ্টম্বর (২০০৮) মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে প্রমাণ মেলে যে, গ্রেফতারকৃত আসামীরা হিন্দুদের ওপর কথিত নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বাংলাদেশে স্লীপার সেল পাঠাতে চেয়েছিল। পাঁচ বছর আগে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এমন ৫৪ জন সন্ত্রাসীকে পুলিশ এ পর্যন্ত সনাক্ত করতে পেরেছে। প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণার্থী সন্ত্রাসীদের বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে হিন্দুদেরকে যথাযথ অধিকার দেয়া হয় না। (Times of India, Malegoan accused wanted cells in Bangladesh, New Delhi, 29 December, 2008.)

'অভিনব ভারত'এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা সমীর কুলকার্নিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই তথ্য বেরিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে, মালেগাঁও বিস্ফোরণে নিহত ছয় জনের মধ্যে একজন আসামীও ছিল। কুলকার্নি পুলিশকে জানায় যে, সংগঠনটি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ এবং সারা দেশে প্রায় পাঁচ হাজার সদস্য ছিল। তাছাড়া বাংলাদেশেরও বেশ ক'জন সদস্য ছিল। 'অভিনব ভারত' এর কর্মীদেরকে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিশোধ নেয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তাদেরকে 'চুপ' থাকতে বলা হয়। কেবলমাত্র নির্দেশ দেয়ার পরই তাদেরকে কাজে নামতে বলা হয়। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর কথিত হামলা সম্বন্ধে তাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয় এবং কর্মীরা বাংলাদেশে একটি শাখা খুলতে চেষ্টা করেছিল। কালকার্নিক আটক হবার খবর শোনামাত্র 'অভিনব ভারত' এর

www.pathagar.com

বাংলাদেশী সন্ত্রাসীরা ভারত থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে চলে আসে। (পূর্বোক্ত) পুলিশ জানতে পেরেছে যে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের কয়েকজন গোপন বৈঠকে অংশ নেয়ার জন্য ভারতে গমন করে। (পূর্বোক্ত)

সুলেখা ডট কম (অক্টোবর ২৫,২০০৮) জানায় যে, এটিএস মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অবসরপ্রাপ্ত মেজর প্রভাকর কুলকার্নিসহ দু'জন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে আটক করে। কেন্দ্রীয় হিন্দু সামরিক শিক্ষা পরিষদ (Central Hindu Military Education Society) কর্তৃক পরিচালিত নাসিকস্থ বনসলা সামরিক মহাবিদ্যালয়ে যাবার আগে কুলকার্নি সামরিক টেরিটোরিয়াল আর্মীতে ১২ বছর চাকরি করেছিল। আর অন্য কর্মকর্তারা কাজ করত সামরিক গোয়েন্দা শাখায়। আটককৃত হিন্দু চরমপন্থী প্রজ্ঞাঠাকুর, শিব নারায়ন সিং, কালসানগ্লাম প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সেনা কর্মকর্তাদের নাম বেরিয়ে আসে। কুলকার্নি ও উপাধ্যাকে একটি সামরিক স্কুল পরিচালনার জন্য সন্দেহ করা হয়।

(http.www.hindustantimes.com//StoryPage.aspx?section Name=Homepage=4cccf94-a9f7-baa3-fb8091fa9a34&Headline= Malegaon+blast%3a+2+ex-Army+men+held+)

ভারতের কর্মরত এবং সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ও জড়িত থাকার বিষয়টি অশনি সংকেত বিশেষ। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘঠেছে। সমালোচকদের বিশ্বাস, ভারতীয় হিন্দু পরিষদ, আরএসএস, বজরং দল, বিজেপি প্রভৃতি যুগ যুগ ধরে অবিরাম হিন্দুত্ববাদী মতবাদের মাদকতা প্রচারের কারণে এ ধরনের উগ্রতা ও হিংস্রতা সময়ের ব্যবধানে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও শিক্ষা বিভাগের মতো স্পর্শকাতর বিভাগেও ছড়িয়ে পড়েছে।*

www.pathagar.com

ভারতীয় মুসলমানদের দুর্বিসহ অবস্থার কথা ভাবতে গেলে সাবেক কমিউনিস্ট-শাসিত দেশসমূহের কথা মনে পড়ে। ঐ সব দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা বহির্বিশ্বের তেমন একটা আসতো না। তাই তাদেরকে বলা হতো লৌহ যবনিকার অন্তরালের মানুষ। তারা আসলে কেমন আছে, তা' বাদবাকী বিশ্বের মানুষ খুব সামান্যই জানার সুযোগ পেত বলেই তাদের ব্যাপারে এমন মন্তব্য (লৌহ যবনিকার অন্তরালের মানুষ) অনেকটা প্রবাদে পরিণত হয়।

ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল বলে মনে হয় না। সাম্প্রদায়িকতায় আকীর্ণ ভারতীয় মিডিয়ার স্বআরোপিত সেন্সরশীপের কারণে মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার অতি সামান্যই বহির্বিশ্বে, এমনকি খোদ ভারতে প্রকাশ পায়। ধর্ম নিরপেতা ও গণতন্ত্রের খোলস-পরা চরম সাম্প্রদায়িকতা দোষেদুষ্ট ভারতে মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে অধিকার ও প্রতিনিধিত্বহীন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত, শিক্ষা ও বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া, সামাজিকভাবে নিগ্রহীত, সাংস্কৃতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পশ্চাদপদ প্রান্তিক জনগোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছে। তাদের জীবন, মান-ইজ্জত, সহায়-সম্বল কিছুই নিরাপদ নয়। তারা কেমন বৈরী পরিবেশে কেমন অন্যায় অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে নির্যাতিত হচ্ছে, তারই একটি ইঙ্গিত আলোচ্য গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। ভারতীয় নীতি নির্ধারক ও রাজনীতিবিদ, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা, এমনকি মিডিয়া কেমন মুসলিম-বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা দোষেদুষ্ট তা' অনুধাবনে এ গ্রন্থ কিছুটা হলেও সাহায্য করবে বলে মনে করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। গ্রন্থটি ভারতে চলমান গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ও নতুন ভাবনার জন্ম দেবে।*